ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ৭ সংখ্যা : ২৫
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১১

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

সূচিপত্র

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ৭, সংখ্যা : ২৫

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : জানুয়ারি-মার্চ : ২০১১

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৭১৬০৫২৭

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭ ২২০৪৯৮, বিপণন বিভাগ : ০১৯৪০ ৩৮২১২৮
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
Web : www.ilrcbd.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা।

প্রচ্ছদ : আনি-নূর

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিটার্স

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam. General Secretary. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 100 US $ 5

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ ৭, সংখ্যা ২৫
জানুয়ারি-মার্চ ঃ ২০১১

সম্পাদকীয়

কিভাবে ইসলামী সমাজ গড়ে উঠেছিল

একক জীবন যাপনের মধ্যে একটা নিসঙ্গতা আছে। সে নিসঙ্গতা হচ্ছে মানুষের, প্রকৃতির নয়। প্রকৃতির কোলেই তার জন্ম। গাছের ফল, ঝরনার পানি, গাছ-পালার ছাল-পাতা একক মানুষের জীবন যাপনের উপকরণ হতে পারে। কিন্তু মানুষের সাথে সমাজবদ্ধভাবে বাস করতে গেলে তাকে একটা ভিন্ন পরিবেশ গড়ে তুলতে হয়। একসাথে জীবন যাপনের উপযোগী কিছু ভিন্ন নিয়ম-কানুন তৈরি করতে হয়। সেগুলো হয় এককভাবে জীবন যাপন করা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। সেখানে তাকে পাল্লা দিতে হয় প্রকৃতির সাথে নয় বরং মানুষের সাথে, যার সাথে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতি পদে পদে। সেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাকে ছাড় দিতে হয়, আত্মত্যাগ করতে হয়। নিজের ইগো ও অহমকে বিসর্জন দিয়ে আবার নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথ যাতে রুদ্ধ না হয় সেজন্য ভিন্ন ধরনের জীবন যাপন এবং ভিন্ন ধরনের বিধিবিধান প্রণয়ন করতে হয়।

এটাকেই বলা হয় সামাজিক জীবন। এ জীবনটা কোনো বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটা একটা জীবন যাপন পদ্ধতি। একসাথে জীবন যাপন করার জন্য যা কিছু করতে হয় সেসবগুলো মিলে এ পদ্ধতি গড়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে ইসলামী সমাজ বলতে এমন একটা জীবন যাপন পদ্ধতি বুঝাবে যেখানে প্রত্যেকটা ছোট বড় কাজ ইসলামের বিধান অনুযায়ী আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য করা হয়।

ইসলামী সমাজ গঠনের একটা প্রক্রিয়া আছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে এ প্রক্রিয়া উদ্ভাবন সম্ভবপর নয়। একমাত্র নবী-রসূলগণই আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে এ প্রক্রিয়া

উদ্ভাবনের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ গঠন করতে পারেন। শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পূর্বে দুনিয়ার কোথাও এ সমাজের অস্তিত্ব ছিল না। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রসূল স.-এর মাধ্যমে এ সমাজ গঠন করেন। এখন শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানা শেষ হয়ে গেছে। তিনি যে আদর্শ ইসলামী সমাজ গঠন করে গিয়েছিলেন তা বহুলাংশে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। কাজেই তাকে নতুন করে অস্তিত্ব দান করতে হবে না এবং উম্মতের পক্ষে এটা সম্ভবও নয় বরং তার পুনরবিন্যাস করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে আমাদের জানতে হবে সে আদর্শ ইসলামী সমাজের কাঠামোটি কিভাবে গড়ে উঠেছিল। কুরআনে মহান আল্লাহ একে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। প্রথম স্তরটিকে বলেছেন সৎকাজে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দল। অর্থাৎ এই স্তরের লোকেরা আল্লাহর নবীর পরশে সকল প্রকার ভেজালমুক্ত খাঁটি সোনারূপে গড়ে ওঠেন। তাঁরা সৎ কাজে একে অন্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অসৎ কাজের প্রতি বিরূপতা তাদের স্বভাবজাত। আর সৎ কাজ কেবল তারা করেই ক্ষান্ত হন না বরং সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে তো তারা অগ্রগামী থাকেনই নিজেদের মধ্যেও কিভাবে অন্যের চেয়ে অগ্রগামী হবেন এ প্রচেষ্টায়ই তারা নিরত থাকেন সর্বক্ষণ। এ ধরনের ঈমানদার মুসলমান কিয়ামত পর্যন্ত পয়দা হতেই থাকবেন। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি এবং পরবর্তীকালে তুলনামূলকভাবে তা কমে আসতে থাকবে।

কুরআনে এদেরকে 'সাবেকীন', 'সালেহীন', 'সাদেকীন', 'মুত্তাকীন', 'মুকাররবীন' এবং 'হিযবুল্লাহ' শব্দগুলো দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। এরা যেমন নেকী ও ভালো কাজে অগ্রগামী তেমনি আপাদমস্তক সৎ ও কল্যাণের বার্তাবহ। এরা এমন লোক নন যারা ভালো কাজ করেন আবার খারাপ কাজও করেন। বরং এরা সজ্ঞানে কোনো খারাপ কাজ করেন না।

এদেরকে সালেহীন বা সৎকর্মশীল এজন্য বলা হয়েছে যে, এরা আপাদমস্তক সততা ও সৎকর্মের প্রতীক। এরা এমন লোক নন যাদের কাজ-কর্মে ভালো ও মন্দ মিশে আছে। বরং এরা কেবল ভালো কাজই করেন। মন্দ কাজের ধারে কাছেও যান না। উন্নত মানবতার এমন নিদর্শন আর কোনো দিন দেখা যায়নি। নবীর সাহচর্যেই এটা সম্ভব হয়েছে।

এরা এমন সাদেকীন– সত্যবাদী লোক যারা আল্লাহর সাথে কৃত তাদের আনুগত্য ও বন্দেগীর ওয়াদায় পুরোপুরি একশ ভাগ 'সাদেক' বা সত্যবাদী প্রমাণিত হয়েছেন। তারা জান্নাতের বদলায় আল্লাহর সাথে তাদের জান-মালের তিজারত করেছেন। আল্লাহ তাদের জান-মাল কিনে নেয়ার পর আবার তাদের কাছে তা আমানত রেখেছেন। সেগুলোকে তারা আল্লাহর আমানত হিসেবে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ব্যয় ও ব্যবহার করেছেন এবং তাতে সামান্য পরিমাণও খেয়ানত করেননি।

এদেরকে মুত্তাকীন বলার কারণ হচ্ছে এই যে, সাধারণ মুসলমানদের মতো এদের মধ্যে তাকওয়া সামান্য পরিমাণ আছে তা নয় বরং এরা আপাদমস্তক ঈমান ও তাকওয়ায় আবৃত। আল্লাহর হুকুমের পরিপন্থী কোনো কাজ করার ব্যাপারে এরা সদা সতর্ক। তা থেকে এরা হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থান করেন।

এরা মুকাররবীন তথা নৈকট্য লাভকারী। কারণ এরা আল্লাহর গুণাবলী ও চারিত্র সৌন্দর্যে নিজেদেরকে সবচেয়ে বেশি সুসজ্জিত করেছেন। তাঁর ইবাদতে এবং তাঁর প্রেমে এরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এক্ষেত্রে অন্য মুসলমানদের থেকে এরা অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। এ জন্য আল্লাহ তাদেরকে নিজের বিশেষ নৈকট্য দান করেছেন এবং কুরআনে বলেছেন : ওয়াস্‌জুদ ওয়াক্‌তারিব– 'সিজদা করো এবং নিকটবর্তী হয়ে যাও।' (সূরা আলাক : ১৯)

এদেরকে হিযবুল্লাহ্ বলার কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে এদের হার্দিক সম্পর্কে কোনো কৃত্রিমতা ও ভেজাল নেই এবং সে সম্পর্ক একেবারে নিষ্কলুষ ও সরাসরি। আল্লাহ ও রসূলের সাথে নাফরমানিকারীরা তাদের ছেলেমেয়ে ভাইবোন আত্মীয়-স্বজন যেই হোক না কেন তাদের সাথে তারা কোনো সম্পর্ক রাখেন না। 'তুমি কখনো আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন দল পাবে না যারা ভালোবাসে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে– এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা-পুত্র-ভাই বা পরিবারের লোকজন হলেও। এদের অন্তরে আল্লাহ সুদৃঢ় করে দিয়েছেন ঈমান এবং নিজের পক্ষ থেকে এক রূহ দান করে তাকে শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এরাই আল্লাহর দল। জেনে রাখো আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।' (সূরা মুজাদালা : ২২)

এ থেকে বুঝা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতী ও নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টার ফলে সর্বপ্রথম এমন একটি দল তৈরি হয়ে যায় যার প্রত্যেকটি সদস্য আল্লাহর কাছে তাদের হৃদয়-মন সঁপে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহর প্রেমে আকণ্ঠ ডুবে গিয়েছিলেন। তাঁদের দৃষ্টি দুনিয়ার তুচ্ছ ও মূল্যহীন জিনিসের প্রতি নয় বরং আখেরাতের কামিয়াবীর প্রতি নিবদ্ধ ছিল। তারা কেবলমাত্র নিজেদের অন্তরের তাগিদে ইসলামের প্রত্যেকটি হুকুম-আহকাম ও বিধিবিধান মেনে চলতেন। এ জন্য তারা বাইরের কোনো চাপের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। বরং অন্য মুসলমানদের ইসলামী বিধিবিধান মেনে চলার ক্ষেত্রে তারা তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করতেন। সমগ্র মুসলিম সমাজে ইসলামী বিধান প্রয়োগ ও প্রবর্তনে তাঁদের ভূমিকা কেন্দ্রীয় মর্যাদা লাভ করে। এমনি তো পুরো মুসলিম উম্মাহকে 'খায়রে উম্মত' বলা হয়। কিন্তু আসলে মুসলমানদের মধ্যে এই সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীটির জন্যই তাদেরকে খায়রে উম্মত বা সর্বোৎকৃষ্ট মানবগোষ্ঠী বলা হয়েছে।

এরা ছিলেন মুসলমানদের সর্বোচ্চ শ্রেণীর অন্তরভুক্ত। কুরআনী দাওয়াতের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ মক্কী যুগ থেকে নিয়ে বদরের যুদ্ধের সময়ের মধ্যে এরা ঈমান এনেছিলেন। তাই এদেরকে আউয়ালীনও বলা হয়। এই আউয়ালীনদের তিনটি অংশ। এদের আরেকটি অংশ ঈমান আনেন বদর যুদ্ধের পর। তারপর তারা হিজরত করেন এবং 'সাবে কুনাল আওয়ালুন'-দের সাথে মিলে আল্লাহর পথে ধন-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করেন। তাদেরকেও সাবেকুনাল আওয়ালুনের মধ্যে গণ্য করা হবে। সাবেকুনের তৃতীয় অংশটি হচ্ছে তাদের সমন্বয়ে গঠিত যারা এরপর ঈমানদারদের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন অথবা মুসলিম উম্মাহর দলভুক্ত হন এবং সাবেকুনাল আওয়ালুনের পদাংক পূর্ণরূপে অনুসরণ করে চলেন। এ তিন ধরনের সাবেকুনাল আউয়ালুনের সমন্বয়ে প্রথম ইসলামী সমাজ গড়ে ওঠে। এরাই ছিলেন সে সমাজের তত্ত্বাবধায়ক ও দায়িত্বশীল।

এরপর পরবর্তী পর্য়ায়ে দ্বিতীয় যে স্তরটি গড়ে ওঠে তাকে কুরআনে বলা হয়েছে 'মুকতাসিদ' অর্থাৎ ইসলামের বিধান মেনে চলার এবং ইসলামী ভাবধারার সাথে একাত্ম হওয়ার জন্য তারা কোনো বাইরের চাপ ও তত্ত্বাবধানের মুখাপেক্ষী ছিলেন না ঠিকই কিন্তু তাদের সহায়তা ও সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। কারণ তাদের মধ্যে নফসে আম্মারাহ (কুমন্ত্রণাদাতা নফস) ও নফসে লাওয়ামার (ভর্ৎসনাকারী নফস)

পড়া যেতে পারে না। এ অবস্থায় স্বাভাবিক বুদ্ধি-জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং নামাযে বিপরীত আচরণ করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এরপর যখন মানসিকতা পুরোপুরি মদের বিপরীত দিকে চলে যায় তখন মদকে পুরোপুরি হারাম ঘোষণা করা হয়।

ফলে মদ হারাম ঘোষণার পর একজনের মনও মদের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। এমনকি যে মজলিসে মদের ফোয়ারা ছুটছিল মদ হারাম হবার ঘোষণা শুনেই সবাই মদের পেয়ালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। মদের পিপা উলটে ও ভেঙে ফেলে দিয়েছিল। যারা পেয়ালা মুখে ঢেলে দিয়েছিল ওই তরল পদার্থ আর তাদের গলার নিচে নামেনি। আর যাদের পেটে চলে গিয়েছিল তারা গলার নালিতে হাত ঢুকিয়ে সবটুকু বমন করে বাইরে বের করে না আনা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয়নি।

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তত্ত্বাবধানে এ সমাজ বন্ধনটি এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, একবার তায়েফ থেকে একটি প্রতিনিধি দল এলো ইসলাম কবুল করার জন্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সামনে চারটি কথা পেশ করলেন। এক, নিয়মিত নামায পড়তে হবে। দুই, মদ পরিত্যাগ করতে হবে। তিন, যাকাত দিতে হবে। চার, রমযান মাসে রোযা রাখতে হবে। প্রতিনিধি দলের লোকেরা বললো, যখন কোনো বিষয়ের ব্যবস্থাপনা হয়, শর্তগুলো একতরফা হয় না। কাজেই আধা-আধি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। নবী স. মেনে নিলেন। তিনি বললেন, ইসলাম গ্রহণ করার পর প্রথম দু'টি শর্ত তোমাদের অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। তারা এটা মেনে নিল এবং ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের এলাকায় ফিরে গেল।

সাহাবাগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা আপনি কেন করলেন? জবাব দিলেন, নামায পড়া ও মদপান না করা এ দুটি তো ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই তাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে যাবে। আর যাকাত দিতে হবে এক বছর পর। এই সঙ্গে রোযা রাখতে হবে রমযান মাস এলে। ততদিনে মুসলমানদের সমাজব্যবস্থার মধ্যে অবস্থান করে তারা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যার ফলে বাকি দুটি শর্ত স্বস্ফূর্তভাবে পালনে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামী সমাজের প্রাথমিক কাঠামোগুলো নির্মাণ করে চলেছিলেন।

সংঘাত ছিল। এ অবস্থায় বাইর থেকে উপদেশ ও সৎ পরামর্শ তাদের নফসে লাওয়ামাকে শক্তিশালী করতো। ফলে তারা এমন অবস্থায় উপনীত হতেন যার ফলে নফসে আম্মারার প্ররোচণায় তারা কখনো কোনো গুনাহ করলেও অস্থির হয়ে পড়তেন এবং আল্লাহর দরবারে তৎক্ষণাৎ নিজেদের গুনাহখাতার জন্য কান্নাকাটি করে সমগ্র অন্তর দিয়ে মাফ চাইতেন।

এদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, 'আর অন্য আরেকটি দল হচ্ছে যারা তাদের গুনাহর স্বীকৃতি দিয়েছে। তাদের আমল মিশ্র প্রকৃতির অর্থাৎ উভয় ধরনের। আল্লাহ তাদের প্রতি শিগগিরই দৃষ্টিপাত করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়'। (সূরা তাওবা : ১০২)

এদেরকে মহান আল্লাহ 'মুকতাসিদ' অর্থাৎ মাঝারী পর্যায়ের বলেছেন। কারণ সংখ্যা ও আমল উভয় দিক দিয়ে এরা ছিলেন মধ্যম পর্যায়ের। অর্থাৎ প্রথম দলটি থেকে এদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি আবার তৃতীয় দলটির তুলনায় অনেক কম। অন্যদিকে ঈমান ও সৎ কাজের দিক দিয়ে প্রথম দলের তুলনায় নিম্নমানের এবং তৃতীয় দলের তুলনায় উচ্চমানের। এই দলটির অস্তিত্বশীল হওয়ার সময়ই ইসলামের বিস্তারিত বিধানসমূহের অধিকাংশই নাযিল ও প্রবর্তিত হয়। অর্থাৎ মানব সমাজের ধারণক্ষমতার দিকটি এখানে গুরুত্ব লাভ করেছে। স্বাভাবিক ভুল-ভ্রান্তিসহ সমাজ কাঠামো যেমনই ধীরে ধীরে ও দৃঢ়ভাবে সুসংবদ্ধ হতে থেকেছে এবং ইসলামী চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনই জীবনের বিভিন্ন পরিসরের উপযোগী বিধান দেয়া হয়েছে। অনেক সময় তাদের পক্ষ থেকেই বিধান প্রবর্তনের দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। কারণ সময় ও পরিবেশ এখনো উপযোগী হয়নি। যখন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, এখন এই মুহূর্তে আইন প্রণয়ন ও প্রবর্তন করলে গৃহীত ও বাস্তবায়িত হতে পারে তখনই বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।

মদ হারাম করার বিধানটি এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনটি স্তরে মদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করা হয়। প্রথম পর্যায়ে মানুষের মধ্যে যে ঘৃণাবোধ জেগে ওঠে সেটাকে জাগিয়ে রাখা হয়। বলা হয়, মদের মধ্যে ভালোও আছে আবার মন্দও আছে। তবে ভালোর চেয়ে মন্দের দিকটা বেশি। দ্বিতীয় পর্যায়ে মদের প্রতি বিদ্বিষ্ট মনোভাব সৃষ্টি করা হয়। বলা হয় মদ এতই খারাপ জিনিস যে, মদ খাবার পর নামায

এরপর আসে ইসলামী সমাজের তৃতীয় স্তরটির কথা। এ স্তরটির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন অসংখ্য মুসলমান, যারা ইসলামী সমাজের বৃহত্তর অংশ। তাদের ওপর ছিল নফসে আম্মারার প্রচণ্ড চাপ। তাদের নফসে লাওয়ামাহ একদম মৃত না হলেও প্রভাবহীন হয়ে গিয়েছিল। এই ধরনের লোকদের সংখ্যা প্রতি যুগে সবচেয়ে বেশি ছিল এবং থাকবে। ঈমান ও আমলের দিক থেকে এদের অবস্থান হবে বিভিন্ন পর্যায়ের। এদের একটি অংশ নফসে আম্মারার কথায় চলে কিন্তু তাকে আল্লাহ-খোদা বানায় না। বরং তারা যে গুনাহগারের জীবন যাপন করছে এ অনুভূতি তাদের মনে জাগ্রত থাকে। আবার এদের কিছু অংশ নফসে আম্মারার কাছে পরাস্ত হয়। এমনকি এক পর্যায়ে এসে তাদের গুনাহ ও সওয়াবের চিন্তা খুব কমই জাগ্রত থাকে। আবার একদল নফসে আম্মারার কাছে এমনভাবে পরাজিত হয় যে, তাকে প্রায় আল্লাহ-খোদার আসনে বসিয়ে দেয়। তার কথায় চলে ও ওঠাবসা করে। সাধারণভাবে এরা নিজেদের গুনাহের কারণে লজ্জা অনুভব করে না। বরং গুনাহর চেতনা খতম হয়ে যায়।

এই শেষোক্ত সমগ্র দলটিকে মহান আল্লাহ 'যালিমুন লিনাফসিহী' অর্থাৎ নিজের প্রতি যুলুমকারী নামে অভিহিত করলেও আসলে এদের এই শেষের অংশটিই প্রকৃতই যালিম।

তারা নিজেরা স্বতস্ফূর্তভাবে ইসলামী বিধিবিধানের পাবন্দী করবে এমনটি আশা করা যেতে পারে না। তাই শক্তি ও আইন প্রয়োগ করে তাদের ইসলামের সীমানায় রাখার প্রয়োজন ছিল।

ইসলামী সমাজের এই তিনটি স্তরকে কুরআনে আল্লাহ এভাবে বর্ণনা করেছেন :
'ছুম্মা আওরাছনাল কিতাবাল লাযীনাস্ তফাইনা মিন ইবাদিনা,
ফামিন্হুম যা-লিমুন লিনাফসিহ্,
ওয়া মিনহুম মুক্তাসিদ
ওয়া মিনহুম সা-বিকুম বিল খাইরাতে বিইযনিল্লাহ,
যা-লিকা হুয়াল ফাদলুল কাবীর।

'তারপর আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি তাদেরকে কিতাবের অধিকারী করলাম। তবে তাদের কেউ নিজেদের প্রতি যুলুমকারী, কেউ

মধ্যপন্থী আবার কেউ আল্লাহর ইচ্ছায় নেকীর কাজে অগ্রগামী। এটি অনেক বড় অনুগ্রহ।' (সূরা ফাতির : ৩২)

এখানে সামাজিক স্তরবিন্যাস বর্ণনার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তৃতীয় স্তরের কথা প্রথমে এনেছেন। এর বিভিন্ন কারণের মধ্যে একটি বড় কারণ হতে পারে এদের বিপুল সংখ্যাধিক্য। সাধারণ মুসলমানদের অধিকাংশই এ স্তরে অবস্থান করে। তাদের আমল- কর্মধারার ব্যাপক সংশোধনও উদ্দেশ্য এবং তাদের জন্য সমাজের বিভিন্ন আইন কানুনের প্রয়োজন। আইনের প্রয়োগ ছাড়া তাদেরকে ইসলামী সমাজের অন্ত রভুক্ত রাখা কঠিন। আর প্রথম স্তরের লোকদের বর্ণনা করেছেন সবশেষে। মুখ্য কারণ হতে পারে তাদের সংখ্যাল্পতা। তাছাড়া সবশেষে এদের কাজকে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার এবং সমগ্র সমাজ কাঠামোর মূল শক্তি হিসেবে তুলে ধরাও লক্ষ হতে পারে।

এভাবে আল্লাহ তাঁর নিজ অনুগ্রহে এবং তাঁর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রথম আদর্শ ইসলামী সমাজ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। মানব সমাজের ইতিহাসে এটিকে মানবিক স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। যুগে যুগে এটিই মানুষের জন্য আদর্শ। আজকের যুগকে আমরা অত্যাধুনিক বা বিজ্ঞান ও সর্বোচ্চ জ্ঞানানুশীলনের যুগ যাই বলে অভিহিত করি না কেন এই স্বর্ণ যুগের মতো আল্লাহর প্রতি নিবেদিত প্রাণ মানবিক সমাজই আমাদের মহান আদর্শ হয়ে টিকে আছে। সত্যবাদিতা, সত্যনিষ্ঠা, আল্লাহভীতি এবং আল্লাহর গুণাবলী সমন্বিত চারিত্র মাধুর্য অর্জন করে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার ক্ষেত্রে এই আদর্শ ইসলামী সমাজ আজো আমাদের পথের দিশারী। শান্তি, শৃঙ্খলা, সততা, মানবিকতা, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও মানুষকে ভালোবাসা এবং ন্যায় ও ইনসাফের বিধান যেভাবে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন সেটিই আমাদের আদর্শ।

– আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ ৭, সংখ্যা ২৫
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১১

দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক*

[সারসংক্ষেপ : আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে পথনির্দেশনাসহ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। এ নির্দেশনা মান্য করার মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীতে চলার নির্ভুল পথ খুঁজে পায়। মানুষ যখনই আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনা বাদ দিয়ে তাদের নিজস্ব মস্তিষ্ক প্রসূত জ্ঞান দ্বারা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে তখন সমূহ বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। মানব জীবনে অনেক সমস্যা রয়েছে। দারিদ্র্য এসবের অন্যতম। এ মানবিক সমস্যা উত্তরণের লক্ষ্যে মানবজাতির প্রচেষ্টা কখনো থেমে থাকেনি কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মানুষ তাদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা দ্বারা উক্ত সমস্যার সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য সমাধান করতে পারেনি বরং কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্ভোগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। দারিদ্র্য সমস্যা যেহেতু একান্তভাবে আমাদের জীবন-ঘনিষ্ঠ এবং বিষয়টি যেহেতু কোনভাবে উপেক্ষা করার মত নয় কাজেই সে বিষয়ে একটি পথ খুঁজে বের করা একান্ত প্রয়োজন। ইসলাম যেহেতু সকল সমস্যার সমাধানে সক্ষম কাজেই ইসলাম কীভাবে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণে অভাবনীয় ভূমিকা রেখেছিল সে বিষয়টি আলোচনার দাবি রাখে। অত্র প্রবন্ধের মাধ্যমে দেখাতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, কীভাবে ইসলামের আদর্শ পুরোপুরি অনুসরণ করে দারিদ্র্য বিমোচন করা যায়।]

ভূমিকা

দারিদ্র্য একটি সামাজিক ও মানবিক সমস্যা । সম্ভবত পৃথিবীতে মানব সভ্যতা যতটা প্রাচীন, দারিদ্র্য সমস্যাটাও ততটাই পুরাতন। বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষের যুগেও মানুষ দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাত থেকে মুক্ত নয়। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো তো বটেই খোদ উন্নত দেশগুলো সম্পূর্ণ দারিদ্র্য মুক্ত-এ দাবিও সম্ভবত করা যায় না। বর্তমান বিশ্বে রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ ও মানব সেবায় নিয়োজিত অসংখ্য ব্যক্তি ও সেবা-সংগঠন বিশ্ব মানবতাকে দারিদ্র্য মুক্ত করার লক্ষ্যে প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে আসছে। বিশেষত জাতিসংঘ দারিদ্র্যকে অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন

---

* সহকারী অধ্যাপক, এসএসএইচএল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। দারিদ্র্যপীড়িত বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার এনজিও বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার নিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। দারিদ্র্যকে পুঁজি করে কোন কোন ব্যক্তি ও সংগঠন নিজ নিজ ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারলেও ভাগ্যাহত দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে এমনটি মনে হয় দাবি করা যাবে না। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মানব জাতির সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুসলিমগণ তাদের সমাজ ও রাষ্ট্রকে দারিদ্র্য মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বর্তমান বিশ্বে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল নিয়ে নানা উদ্যোগ ও প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সমাজ ও রাষ্ট্রকে তারা প্রত্যাশিত পর্যায়ে দারিদ্র্যমুক্ত করতে সক্ষম হয়নি। কোন কোন উদ্যোগ দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রের কবলে ফেলে জনজীবনে দুর্ভোগ আরোও বাড়িয়ে তুলছে। এই প্রেক্ষাপটে ইসলাম দারিদ্র্যকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছে এবং কোন পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে দারিদ্র্য বিমোচন করতে সক্ষম হয়েছিল তা খতিয়ে দেখা একান্ত প্রয়োজন। এসব বিষয়কে সামনে রেখে প্রবন্ধটিকে নিম্নোক্ত পর্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। দরিদ্র্য; গণপ্রাজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে কৃষক ও শ্রমিক মুক্তি প্রসঙ্গ; সমাজে দারিদ্র্যের প্রভাব; নৈতিকতার উপর দারিদ্র্যের প্রভাব; দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচেষ্টা; দারিদ্র্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি; দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম-সমর্থিত উপায়সমূহ, দারিদ্র্য বিমোচনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক পদক্ষেপসমূহ।

দারিদ্র্য

সমস্যা হিসাবে দারিদ্র্যের সৃষ্টি মানব জাতির ইতিহাসের সূচনাতে চিহ্নিত হলেও দারিদ্র্যের প্রচলিত সংজ্ঞা এবং পরিমাপ পদ্ধতিতে এখনও বেশ অসংগতি পরিলক্ষিত হয়। সংজ্ঞা ও পরিমাপের বিষয়ে এ সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণে অনেক ক্ষেত্রে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থার প্রকৃত চিত্র যথাযথভাবে ফুটে ওঠে না। যেমন দরিদ্র বলতে এমন ব্যক্তি বা দেশকে বুঝায় যার সামান্য সম্পদ ও স্বল্প আয় রয়েছে যার দ্বারা Basic needs মেটাতে সে ব্যর্থ।[১] তবে ইসলামী আইন শাস্ত্রে দারিদ্র্যের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে। আর দরিদ্র ব্যক্তিকে সচ্ছল করে তোলাই যেহেতু ইসলামী অর্থনীতির মূল লক্ষ্য কাজেই সে লক্ষ্য অর্জন করতে হলে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সাধারণত সম্পদের স্বল্পতাকেই 'দারিদ্র্য' বলা হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে দারিদ্র্যের দুটো অর্থ আছে। প্রথমত, দারিদ্র্য এমন একটা অবস্থা যেখানে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে নির্ধারিত

ন্যূনতম শরীর বৃত্তীয় প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নয়। এটাকে অনাপেক্ষিক দারিদ্র্য বা Absolute poverty বলা হয়। দ্বিতীয়ত, দারিদ্র্য হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট সমাজের আয় অথবা সম্পদ বিতরণে একজন ব্যক্তি অথবা একটি পরিবারের অবস্থান সূচক নির্দেশক। এটাকে আপেক্ষিক দারিদ্র্য বা Relative Poverty বলা হয়। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের দারিদ্র্য পরিমাপ করার নির্ধারিত মান হচ্ছে, প্রতি দিন জীবন ধারণের জন্য ২১২২ কিলো ক্যালোরি ও ৫৮ গ্রাম প্রোটিন খাবার সংগ্রহে সক্ষম জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য সীমার নিচে এবং ১৮০৫ কিলো ক্যালোরি যারা জোটাতে পারে না তারা চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে।[২]

কুরআন ও হাদীসে বিশেষত যাকাত বন্টনের খাত আলোচনায় দরিদ্র ব্যক্তিকে 'ফকীর' এবং 'মিসকীন' এই দু'টি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে।[৩] তবে ফকীর এবং মিসকীন কারা-এ ব্যাপারে ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদগণের মাঝে একাধিক অভিমত থাকলেও এ ব্যাপারে সবাই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ফকীর এবং মিসকীন একই শ্রেণীর দু'টি অংশ যারা উভয়েই অভাবী ও মুখাপেক্ষী। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণের অভিমত নিম্নরূপ–

* 'ফকীর' মিসকীনের তুলনায় খারাপ অবস্থার হয়ে থাকে। কেননা ফকীর হল সেই ব্যক্তি যার কাছে কিছু নেই অথবা যদিও কিছু থাকে তাহলে তা তার এবং পরিবারের প্রয়োজনের অর্ধেক পূরণ করে।[৪]
* 'ফকীর' শব্দটি সাধারণভাবে সকল মুখাপেক্ষী লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, চাই শারীরিক বৈকলংগের কারণে হোক, কিংবা বার্ধক্যের কারণে হোক, স্থায়ীভাবে মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ার কারণে হোক অথবা এমন ব্যক্তি, যে কোন কারণে সাময়িকভাবে মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে এবং সাহায্য-সহযোগিতা পেলে পুনরায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে-এ ধরণের সকল মুখাপেক্ষী লোকের ক্ষেত্রে 'ফকীর' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। যেমন ইয়াতীম, বিধবা, বেকার এবং এমন সব লোক যারা সাময়িকভাবে দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে।[৫] এক কথায় বলা যায়, ফকীর শব্দটি ব্যাপকার্থবোধক। যাদের জীবিকা নির্বাহের কোন উপায়-উপকরণ নেই, যারা সর্বতোভাবে নিঃস্ব, অর্থের ভিখারী, তারাই ফকীর। অন্য কথায় বলা যায়, ফকীর বলতে চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বুঝায় যাদের স্বাভাবিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধাসমূহ পূরণার্থে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ নেই বা বৈধভাবে উপার্জনের সম্মানজনক উপায় নেই আধুনিক পরিভাষায় এ ধরনের দারিদ্র্যকে Hard Core Poverty (চরম দারিদ্র্য) অবস্থা বলা হয়।

* 'মিসকীন' সেই ব্যক্তি যার কাছে নিজের প্রয়োজনের অর্ধেক অথবা তার চেয়ে বেশি সম্পদ আছে কিন্তু এ সম্পদ তার প্রয়োজন পূরণ করে না। এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ আবুল আলা বলেন, "যার মধ্যে অভাব, দীনতা এবং ভাগ্যাহত অবস্থা পাওয়া যায় এমন লোকই মিসকীন"। নবী স. এ শব্দটি বিশ্লেষণ করে বলেছেন, যারা প্রয়োজন অনুযায়ী জীবনোপকরণ জোগাড় করতে পারে না এবং অবস্থায় শোচনীয় নিমজ্জিত আছে কিন্তু আত্মসম্মানবোধের কারণে কারো দ্বারস্থ হয় না আবার তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে লোকেরা তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ায় না। হাদীসে মিসকীনের পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে, "মিসকীন হল ঐ ব্যক্তি যে নিজের নিত্য প্রয়োজন মেটাবার মত অর্থ সম্পদ পায় না, তাকে যে সাহায্য করতে হবে তাও বুঝা যায় না এবং প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে চাইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এরা হচ্ছে সম্ভ্রান্ত মানুষ, তবে গরীব ও অসচ্ছল"।[৬]

বাংলাদেশের সংবিধানে কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি প্রসঙ্গ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪ ধারায় 'কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি' শিরোনামে বলা হয়েছে : রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে- কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহ সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্ত করা।

সংবিধানের ১৫ ধারায় 'মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা' শিরোনামে বলা হয়েছে : রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায় :

* অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা ;
* কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করে যুক্তিসংগত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার ;
* যুক্তিসংগত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার এবং
* সামাজিক নিরাপত্তা অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতি জনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার।

সংবিধানের ১৯ ধারায় 'সুযোগের সমতা' শিরোনামের অধীনে পৃথক দু'টি উপধারায় বলা হয়েছে : সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

১. সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

২. মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

সংবিধানের ২০ ধারায় 'অধিকার ও কর্তব্য' শীর্ষক শিরোনামের অধীনে পৃথক দু'টি উপধারায় বলা হয়েছে :

১. কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয় এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী"- এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।

২. রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবে না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত হয়েছে; 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি'। এ অংশে যা বর্ণিত হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে, শুধু দারিদ্র্য হ্রাসই নয়, উল্লেখিত বহুমুখী বঞ্চনার নিরসনই হচ্ছে বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালকদের মৌলিক দায়িত্ব।[৭]

সমাজে দারিদ্র্যের প্রভাব

দারিদ্র্য একটি সামাজিক সমস্যা। দারিদ্র্যের কশাঘাত ও ক্ষুধার নির্মম যাতনা মানুষকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে, মানবতাবোধের বিলুপ্তি ঘটায়, কলিজার টুকরা সন্তানকে কখনো বিক্রি করতে আবার কখনো হত্যা করতে বাধ্য করে। এছাড়াও মানুষ তার বোধ-বিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব এক কথায় মূল্যবোধের বিনাশ ঘটায়। এমনকি দারিদ্র্য মানুষকে কুফরীর দিকে নিয়ে যায়। এ কারণে মহানবী স. দারিদ্র্য ও কুফরী থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে বলেছেন: "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কুফর ও দারিদ্র্য থেকে পানাহ চাচ্ছি। এ সময় এক ব্যক্তি বলল, আপনি কি এ দুটোকে সমপর্যায়ের মনে করেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ"।[৮]

ধনাঢ্যতা ও প্রাচুর্যতার ফিতনা দারিদ্র্যের চেয়েও ভয়াবহ ও বিপদজ্জনক। উপরে বর্ণিত হাদীসে সেই শাশ্বত চিত্রই ফুটে ওঠেছে। ইসলাম ধনাঢ্যতাকে আল্লাহর নিআমত মনে করে, যার শোকর আদায় করা উচিত। পক্ষান্তরে ইসলাম দরিদ্রতাকে বিপদ মনে করে, যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।[৯]

দারিদ্র্য মানুষের চিন্তা শক্তিকে নি:শেষ করে দেয়। বলাবাহুল্য একবার ইমাম মুহাম্মদ র.-কে তাঁর গৃহ পরিচারিকা এসে সংবাদ দিল যে, তাঁর ঘরের আটা ফুরিয়ে গেছে। তিনি জবাবে বললেন : "আল্লাহ্ তোমার অমঙ্গল করুন, এই সংবাদে আমার মাথা থেকে ফিক্‌হের ৪০টি মাস্‌আলা উধাও হয়ে গেছে"।[১০]

নৈতিকতার উপর দারিদ্র্যের প্রভাব

দারিদ্র্য ঈমানের জন্য যেমন হুমকি, নৈতিকতার জন্যও একই রকম হুমকি। কারণ দারিদ্র্য মানুষকে এমন সব অনভিপ্রেত কাজ করতে প্ররোচিত করে যা নৈতিকতা বিরোধী। দারিদ্র্যের প্রভাব থেকে পারিবারিক জীবনও মুক্ত নয়। কেননা তা সুখী পরিবার গঠনে একটি বড় অন্তরায়। যুবক ও যুবতীর বিবাহ বন্ধন সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রেও এটি প্রতিবন্ধক। তাই কুরআন মাজীদে এই শ্রেণীর লোককে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পবিত্রতা অবলম্বন ও ধৈর্য ধারণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে- "যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাব মুক্ত না করার পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে"।[১১]

এমনকি তীব্র দারিদ্র্যের কারণে কখনো পিতা তার সন্তানকে হত্যা করতেও দ্বিধা করে না। কুরআন মাজীদ এ ব্যাপারে ঘোষণা করেছে-"তোমাদের সন্তানদেরকে দরিদ্রতার ভয়ে হত্যা করো না। তাদের আমিই রিয্‌ক দেই এবং তোমাদেরকেও। কিন্তু তাদের হত্যা করা মহাপাপ।"[১২] মহানবী স. হাদীসে দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যাকে শিরকের পরই উল্লেখ করেছেন।[১৩]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে যে বিষয়টি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে তা হচ্ছে, দারিদ্র্য কখনো কখনো নিজ সন্তান হত্যা করার ন্যায় পাপ কাজে প্ররোচিত করে। কাজেই দারিদ্র্য যে নৈতিকতাকে কুরে কুরে নি:শেষ করে দেয় উপরোক্ত বর্ণনা তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ।

দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচেষ্টা

বর্তমান বিশ্বে যে সকল ব্যক্তি ও সংস্থা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে তারা এক বাক্যে বিশ্ববাসীর সামনে এ বক্তব্য

নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন যে, দারিদ্র্যের অস্তিত্বকে জাতীয় কিংবা বিশ্ব পরিসরে আর মেনে নেয়া যায় না। তাদের এ লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে জাতিসংঘ (UN), বিশ্বব্যাংক (WB), আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) কাজ করে যাচ্ছে। অপরদিকে বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিকে তাদের প্রধান কর্তব্য মনে করছে।

দারিদ্র্য বিমোচন উদ্যোগের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে প্রথমেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয় ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সামাজিক শীর্ষক সম্মেলন (World Social Summit) এবং ২০০০ সালে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় Millenium Development Summit এর প্রতি, সেখান থেকে ঘোষিত হয়েছিল Millenium Development Goals বা এমডিজি। এমডিজির মূল বক্তব্য হচ্ছে, ২০১৫ সালের মধ্যে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য অর্ধেক হ্রাস করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা কৌশল হিসাবে ক্ষুধা ও চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, নারী পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসকরণ, মাতৃ-স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, এইচ আইভি/এইড্স, ম্যালেরিয়া ও জটিল রোগ প্রতিরোধ, টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব বা গ্লোবাল পার্টনারশীপ ইত্যাদি কর্মসূচি চালু করছে। উপরে বর্ণিত লক্ষ্যসমূহ নিঃসন্দেহে উন্নয়নে তথা দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কিন্তু ২০০০-২০১৫ পর্যন্ত ১৫ বছরের যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তার অর্ধেকেরও বেশি সময় ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও লক্ষ্যমাত্রা ৫% ভাগ অর্জিত হয়েছে এমন দাবি করা যাবে কি? জবাব আসবে, নিশ্চয় নয়।[১৪]

দারিদ্র্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

দারিদ্র্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে সে বিষয়ে আমাদের সমাজে একটা বিভ্রান্তি ব্যাপক প্রচারণা লাভ করেছে। আর তা হচ্ছে,স্বয়ং মহানবী স.-এর দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট পবিত্র জীবনধারা, বিশিষ্ট সাহাবা কিরাম বিশেষত আসহাবে সুফ্ফার[১৫] জীবন দর্শন, বিশিষ্ট সাহাবী আবু যার গিফারী রা.-এর ন্যায় সর্বস্ব ত্যাগী সাহাবীর কতিপয় অভিমত ইত্যাদির প্রেক্ষিতে একদল আধ্যাত্মিক লোক মনে করেন, দারিদ্র্য কোন সমস্যা নয় বরং আল্লাহর নিআমত। অদৃষ্টবাদীরা মনে করে, দারিদ্র্য হচ্ছে অদৃষ্টের লিখন। তাই দরিদ্রদের প্রতি তাদের উপদেশ হচ্ছে. "এটাই তোমাদের জন্য আল্লাহর বন্টন এবং এতেই সন্তুষ্ট থাক"। আর এক শ্রেণীর লোক দারিদ্র্যকে সমস্যা মনে করে

এবং সমাধানও চায় কিন্তু ধনীদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান-খয়রাত ছাড়া এর কোন সমাধান তাদের কাছে নেই। খোদ মুসলিম সমাজে দারিদ্র্য সম্পর্কে উপরোক্ত রূপ বিভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়। ড. ইউসুফ আল-কারযাভী এ ব্যাপারে বলেন, "বিভিন্ন বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে কিছু কিছু মুসলিম সূফীর মাঝেও এ ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, যা ইসলামী সংস্কৃতির সাথে মিলে তার স্বচ্ছতাকে ঘোলাটে করে ফেলেছে"।[১৬]

এই ঘোলাটে অবস্থার সুযোগে বর্তমানে এই অপপ্রচার চালান হচ্ছে যে, ইসলামে দারিদ্র্য সমস্যার কোন সমাধান নেই বরং ইসলাম-দান-খয়রাত ও যাকাত-ফিতরার কথা বলে দারিদ্র্যকে লালন করছে। এ কথাও বলা হচ্ছে, মুসলমান হওয়া মানেই দারিদ্র্য, বিপত্তি ও ক্লেশময় জীবনকে বরণ করে নেয়া। প্রকৃতপক্ষে এসব বক্তব্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। একটু নিরপেক্ষ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কুরআন-সুন্নাহ ও ইতিহাসের দিকে তাকালে এ সত্যই ফুটে ওঠে।

দারিদ্র্যকে যারা আল্লাহর মহানিআমত মনে করেন, ইসলাম তাদের বক্তব্য সমর্থন করে না। কারণ কুরআনে কিংবা হাদীসে এমন একটি বাণীও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যাতে দারিদ্র্যের প্রশংসা উৎকীর্ণ হয়েছে বরং দারিদ্র্য যে মানবতার জন্য বিপজ্জনক ও মর্যাদাহানীকর সেই কথাই মূলত বর্ণিত হয়েছে। কৃচ্ছ সাধনার প্রশংসায় যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর অর্থ দারিদ্র্যের প্রশংসা নয়। কারণ যুহ্দ বা দুনিয়াবিমুখতা এমন কিছুর দাবি করে যাতে কৃচ্ছ সাধনা করা যায়। আর সত্যিকার যাহিদ বা দুনিয়া বিমুখ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে দুনিয়ার মালিক হয়েছে, এরপর তাকে হাতে রেখেছে, অন্তরে স্থান দেয়নি। যারা দারিদ্র্যকে ভাগ্যের লিখন বলেন এবং এর কোন সমাধান নেই দাবি করেন, ইসলাম তাদের বক্তব্য সমর্থন করে না। কেননা আল্লাহ্ বলেন- "এবং দুনিয়া হতে তোমার অংশ ভুলে যেও না"।[১৭] বর্ণিত আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ভাগ্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করার এবং নিজের অধিকার আদায়ে পিছিয়ে না থাকার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজেই দারিদ্র্যের সমাধান নেই কিংবা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে চেষ্টা করা সংগত নয় একথা বলা মোটেও সমীচীন নয়।

দারিদ্র্যের জন্য যারা দরিদ্র ব্যক্তিকে দায়ী মনে করেন, তাদের ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে, ইসলাম ব্যক্তিকে তার কর্মের জন্য দায়ী করে। ব্যক্তি অলস কিংবা অকর্মণ্য হলে ইসলাম তাকে ঘৃণা করে। পক্ষান্তরে শত চেষ্টা করার পরও যদি সে রুটি-রুজির ব্যবস্থা করতে না পারায় বাধ্য হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করে-সে

অবস্থায় সচ্ছল ব্যক্তিদের কিছু করণীয় নেই-ইসলাম এমন কথা সমর্থন করে না। বরং ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে, এমন ব্যক্তিকে সাহায্য করতে হবে এবং ধনীদের সম্পদে তাদের যে অধিকার রয়েছে তা আদায় করতে হবে।

যারা ধনিক শ্রেণীর প্রচন্ড বিরোধী এবং তাদের নির্মূল ব্যতিরেকে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয় মনে করেন, তাদের ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে– ধনীদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত কিংবা ধনীদের নির্মূলের মাঝে দারিদ্র্য বিমোচনের কোন পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না বরং ধনীকে তার দায়িত্বের কথা স্মরণ করে দিয়ে তা পালনে বাধ্য করতে হবে এবং এও স্বীকার্য সত্য যে, সকল হক আদায় পূর্বক ইসলামে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত, তবে সে মালিকানা নিরংকুশ নয়। কারণ সম্পদের নিরংকুশ মালিকানা একমাত্র আল্লাহর।

দারিদ্র্য বিমোচনের ইসলাম সমর্থিত উপায়সমূহ

ইসলাম দারিদ্র্যকে ঈমান, নৈতিকতা, চরিত্র, নিরাপত্তা এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি মনে করে। আর এ জন্যই ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচনের কাজকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং দারিদ্র্য সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য সকল উপায় বর্ণনা করে সমাজের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছে। আর ইসলামী অর্থনীতির মূল লক্ষ্যও হচ্ছে, সকল মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা, ধনী-দরিদ্রের মাঝে বিদ্যমান ব্যবধান কমিয়ে আনা এবং সম্পদকে মানবতার কল্যাণে ব্যয় করা। ইসলামের মূল বক্তব্যই যেহেতু মানব কল্যাণ তাই অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ইসলাম ব্যাপক ও বহুমুখী উপায় ও পন্থা গ্রহণ করেছে। নিম্নে কতিপয় উল্লেখযোগ্য পন্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হলো-

১. শ্রম

ইসলামের দাবি হচ্ছে, সমাজের প্রতিটি সক্ষম মানুষ কাজ করবে এবং অলস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে না। তাই রিযকের অন্বেষণে ইসলাম প্রত্যেককে পৃথিবী চষে বেড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন মাজীদে ঘোষিত হয়েছে-"তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন, অতএব তোমরা এর দিগ-দিগন্তে বিচরণ করো এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ করো" ।[১৮]

অপর এক আয়াতে আছে-"নামায শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযক) সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হয়" ।[১৯]

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় থেকে যে বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় তা হচ্ছে, শ্রমই দারিদ্র্য বিমোচন এবং সম্পদ উপার্জনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। তাই ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষেত্রে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের জন্য ক্ষতিকর কর্ম ছাড়া ইসলাম কোন পেশা গ্রহণে বাধা প্রদান করে না বরং অনুপ্রেরণা যোগায়। শ্রম বিমুখতাকে ইসলাম ঘৃণা করে। ইসলামে প্রতিটি হালাল উপার্জনই সম্মানজনক মহৎ কাজ। মহানবী স. বলেছেন- "কাঠের বোঝা পিঠে বহন করে বিক্রির নিমিত্তে নিয়ে আসবে। এরপর আল্লাহ তোমার আহার্যের ব্যবস্থা করবেন-এটি মানুষের নিকট হাত পাতার চেয়ে উত্তম"।[২০]

মহানবী স. উপরোক্ত তাত্ত্বিক বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং মানুষের নিকট নিজের এবং পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেছেন: "নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ কখনো আহার করেনি। আল্লাহর নবী দাউদ আ. নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য গ্রহণ করতেন"।[২১]

বিস্ময়ের কিছু নেই, আমরা ইসলামের ইতিহাসে বহু প্রথিতযশা কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব দেখতে পাই যারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন এবং সে কারণে তাদের কারো কারো নামের সাথে আল-জাস্সাস (চুন ব্যবসায়ী), আল-খায়য়াত (দর্জি), আল-কাত্তান (তুলা ব্যবসায়ী) ইত্যাদি বিশেষণ সংযোজিত হয়েছে। কাজেই ইসলাম 'শ্রম' কে সর্বাধিক মর্যাদা প্রদান করেছে এবং অলসতা ও ভিক্ষাবৃত্তিকে ভীষণভাবে নিরুৎসাহিত করেছে।

২. আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য মানুষ শ্রমকে বেছে নিবে ইসলামে এটাই প্রত্যাশিত, যারা কাজ করতে অক্ষম যেমন চির-রোগী, সাময়িক রোগী, প্রতিবন্ধী, নিরুপায়, দুঃস্থ, বেকার তাদের কথা স্বতন্ত্র। ইসলাম তাদেরকে দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করেছে। আর তা হচ্ছে, অসচ্ছলের পাশে সচ্ছল আত্মীয়-স্বজন দাঁড়াবে এবং সর্ববিধ সহযোগিতা প্রদান করবে। কুরআন মাজীদে ঘোষিত হয়েছে- "এবং আত্মীয়গণ আল্লাহর বিধানে একে অন্যের চেয়ে অধিক হকদার"।[২২]

ইসলাম আত্মীয়-স্বজনের অধিকারের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছে। কুরআন ও হাদীসে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের হক আদায়ের প্রতি বিশেষ তাকিদ এসেছে। আর যারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে কিংবা তাদের হক আদায় করে না তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির কথা ঘোষিত হয়েছে। কুরআন মাজীদে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার বিষয়ে ঘোষিত হয়েছে- "আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন"।[২৩]

অপর এক আয়াতে আছে, "অতএব তোমরা আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তার হক এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটি উত্তম"।[২৪] আত্মীয়তার-সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে মহানবী স. বলেছেন- "আত্মীয়তা আল্লাহ রহমানুর রাহীমের সাথে জোড়ালাগান ডাল স্বরূপ। সুতরাং আল্লাহ বলেন, যে তোমার সাথে সম্পর্ক রাখে আমিও তার সাথে সম্পর্ক রাখি। আর যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি"।[২৫] অপর এক হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন"।[২৬]

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আত্মীয়দের পারস্পরিক হক অন্য লোকের চেয়ে অধিক। এ হক হচ্ছে তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন। আত্মীয় মারা গেলে যেহেতু অপর আত্মীয় তার উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ করে, কাজেই এক আত্মীয় অপর আত্মীয়ের অসচ্ছলতার সময় সহযোগিতা করবে এটাই প্রত্যাশিত। আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণের অধিকার প্রধানত দু'টি ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়-

ক. মীরাসের ভিত্তিতে এবং
খ. আত্মীয়তার বন্ধনের ভিত্তিতে

প্রথম অধিকারটি সবার জন্য অবধারিত অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন সচ্ছল হোক কি অসচ্ছল সর্বাবস্থায় এ হক আদায় করতে হয়। আর দ্বিতীয় অধিকারটি বিশেষত দারিদ্র্যকালীন সময়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য। আল্লাহ তাআলা বলেছেন- "আর তোমরা তাদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করবে,সচ্ছল তার সাধ্যমতো আর অসচ্ছলও তার সামর্থ্যানুয়ায়ী বিধিমতো খরচ পত্রের ব্যবস্থা করবে"।[২৭]

ফিক্‌হবিদগণ ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয় বিধিবদ্ধ করেছেন : খাদ্য ও পানীয়, শীত ও গ্রীষ্মের উপযোগী পোশাক, বাসস্থান ও আনুসঙ্গিক আসবাবপত্র, রোগীর জন্য চিকিৎসা, অক্ষমের জন্য সেবক-সেবিকা, বিয়ের প্রয়োজন রয়েছে এমন ব্যক্তিকে বিবাহ দেয়া এবং স্ত্রী-পরিজনের ভরণ-পোষণ। তাঁরা আরো বলেন, প্রত্যেক দরিদ্র মুসলিম তার ধনাঢ্য আত্মীয়ের বিরুদ্ধে ভরণ-পোষণের দাবিতে মামলা দায়েরের অধিকার রাখে। তবে এর জন্য প্রয়োজন ইসলামী শরীআহ ও ইসলামী বিচার ব্যবস্থা।[২৮] কাজেই দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের সাহায্যে ধনাঢ্য আত্মীয়-স্বজনের [illegible] আসা উচিত।

৩. যাকাত

যাকাত দারিদ্র্য বিমোচনের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। ইসলাম প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিকে নিজের ও তার পরিবার-পরিজনকে অভাবমুক্ত রাখা এবং আল্লাহর পথে ব্যয়ের জন্য নির্দেশ দিয়েছে। যে ব্যক্তি অসচ্ছল এবং যার মীরাসসূত্রে প্রাপ্ত অর্থকড়ি নেই-যা দিয়ে সে তার চাহিদা মেটাতে পারে, সে তার সচ্ছল-স্বজনের তত্ত্বাবধানে থাকবে। তবে প্রত্যেক ব্যক্তির ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করার মতো সচ্ছল আত্মীয়-স্বজন নাও থাকতে পারে- এমতাবস্থায় সেই অসহায় লোকটির অবস্থা কী হবে সে ব্যাপারে ইসলাম সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছে। এ শ্রেণীর লোকদের জন্য রয়েছে ধনীদের সম্পদে সুনির্দিষ্ট হক আর তা হচ্ছে 'যাকাত'। আর যাকাতের প্রদানের লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন। ফকীর ও মিসকীন হলো যাকাতের অর্থ ব্যয়ের প্রধান খাত। মহানবী স. কোন কোন ক্ষেত্রে এ খাত দুটোর কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। কারণ প্রথমত: এটিই উদ্দেশ্যে। উদাহরণ স্বরূপ মহানবী স. মু'আয রা.-কে ইয়ামানে প্রেরণকালে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা উল্লেখ করা যায়। তিনি তাঁকে বলেছিলেন- "তুমি ধনীদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করে দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করবে"।[২৯]

আল্লাহ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দরিদ্র ও মিসকীনের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ বিধায় নামায ও যাকাতের অপরিহার্যতার ব্যাপারে কোন পার্থক্য করা হয়নি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণিত হাদীসে আছে- "তোমরা নামায আদায় ও যাকাত প্রদানের ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছ। কাজেই যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করল না, তার কোন নামায নেই"।[৩০]

যাকাতের মাধ্যমে মুশরিকদেরকে মুমিনদের থেকে পৃথক করা হয়েছে। কেননা কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে, "দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য, যারা যাকাত আদায় করে না এবং আখিরাতেও অবিশ্বাসী"।[৩১]

সম্পদ ক্রোক ও আর্থিক দন্ড ছাড়াও যাকাত অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। খলিফা আবু বকর রা. বলেছিলেন, "আল্লাহর শপথ ! আমি তাদের (যাকাত অস্বীকারকারী) বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করবো যারা নামায ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য করে, অথচ যাকাত মালের হক। আল্লাহর শপথ ! তারা যদি একটি রশি দিতেও অস্বীকার করে যা তারা আল্লাহর রসূলকে দিতো, তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো"।[৩২]

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে যাকাত আদায়ের অপরিহার্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

যাকাত আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয বিধায় তা ব্যক্তির মর্জির উপর ছেড়ে দেয়া হয়নি যে, সে ইচ্ছা হলে আদায় করবে অন্যথায় আদায় করবে না। যাকাত প্রদান অনুকম্পার বিষয়ও নয় বরং একটি অবশ্য পালনীয় বিধান। যাদের উপর যাকাত ফরয তাদের থেকে তা আদায় করা হবে এবং যাদের প্রাপ্য তা তাদের মাঝে বন্টন করতে হবে। এ দায়িত্ব রাষ্ট্রের। আল্লাহ্ তাআলা বলেন– "আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠাদান করলে তারা নামায আদায় করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে"।[৩৩]

কুরআন মাজীদে ঘোষিত হয়েছে-"তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই যেন ঐশ্বর্য আবর্তন না করে"।[৩৪]

মহানবী স. মু'আয রা.-কে ইয়ামানে প্রেরণকালে বলেছিলেন, "তাদের জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন-যা ধনবানদের নিকট থেকে আদায় করে দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হবে"।[৩৫]

এ সকল বক্তব্য দ্বারা শুধু প্রেরণাই দান করা হয়নি বরং ধন-সম্পদ বন্টনের বাস্তব কর্মপন্থা উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী স. দারিদ্র্যকে অবাঞ্ছিত (কুফরী সমতুল্য) মনে করতেন বলেই দারিদ্র্য বিমোচনের চেষ্টাকে মুমিনের জন্য অপরিহার্য ঘোষণা করেছেন। ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়ে ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ম্যাকানিজম নির্দেশ করেছে।[৩৬]

এসব ম্যাকানিজমের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে যাকাতের ভূমিকা অন্যতম। কেননা কুরআন মাজীদে যাকাতের যে আটটি খাত[৩৭] বর্ণিত হয়েছে তা যদি কার্যকর রাখা যায় তবে এর মাধ্যমে দরিদ্র, অক্ষম ও অভাবগ্রস্ত লোকদের পূর্ণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করা যায়।

৪. উশর

উশর-এর অর্থ এক দশমাংশ। ইসলামী পরিভাষায় জমির ফসলের যাকাতকে উশর বলা হয়। আল্লাহ্ বলেন-"হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি ভূমি হতে যা তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং ব্যয় করতে গিয়ে খারাপ জিনিস দিতে ইচ্ছা করো না"।[৩৮] এ ব্যাপারে মহানবী স. বলেছেন: "বৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ (যাকাত) দিতে হবে এবং সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে"।[৩৯]

জমি থেকে উৎপন্ন সব ধরনের ফসলের উপর উশর ফরয। মহানবী স.-এর সময় উশর আদায়ের কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হতো। এদেরকে 'সাহিবুল উশর' বলা হতো।[৪০]

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় উশর আদায়ের ব্যবস্থা না থাকলেও দীনদার লোকজন তা আদায়ের উদ্যোগ নিতে পারেন।

৫. কাফ্ফারা

কোন পাপ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে তা মোচনের জন্য যে কাজ সম্পাদন করতে হয় তাকে কাফ্ফারা বলে। যেমন শপথ ভংগ করলে কাফ্ফারা আদায় করতে হয়। কাফ্ফারা আর্থিকভাবে আদায় করলে তা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হতে পারে। কাফ্ফারার বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলা বলেন- "অতঃপর কাফ্ফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের আহারদান, যা তোমাদের পরিজনদের খেতে দাও অথবা তাদের বস্ত্রদান কিংবা একটি দাস মুক্তি, তবে যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তিনটি রোযা পালন। তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের কাফ্ফারা, তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো"।[৪১]

বাংলাদেশে ব্যক্তি পর্যায়ে কাফ্ফারা আদায়ের নযীর আছে, তবে তা আরো ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন।

৬. ফিদিয়া

যেসব লোক বার্ধক্যজনিত কারণে কিংবা দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছে, এহেন অবস্থায় তাদের রোযা না রেখে ফিদিয়া আদায়ের সুযোগ রয়েছে। কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে, "রোযা যাদের অতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদিয়া-একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা"।[৪২] ফিদিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ দারিদ্র্য বিমোচনের কাজে ব্যয় হতে পারে। এই ফিদিয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ব্যয়িত হতে পারে।

৭. দেনমোহর

দেনমোহর এমন সম্পদ যা বিবাহের সময় স্বামী তার স্ত্রীকে প্রদান করে থাকে। ইসলামী আইনে এই সম্পদ স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে প্রদান করা ফরয। দেনমোহর স্ত্রীর অর্থনৈতিক অধিকার। কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে, "তোমরা নারীদের তাদের দেনমোহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে"।[৪৩]

উল্লেখ্য যে, দেনমোহরের অর্থ ধনী ও দরিদ্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর নারীর আর্থিক নিরাপত্তা এবং কখনো কখনো তা দারিদ্র্য বিমোচনে বড় ধরনের অবদান রাখতে পারে।

৮. সাদাকাতুল ফিতর

রমযানের রোযা পালন করার পর ঈদুল ফিতরের দিন প্রত্যেক বিত্তবানকে তার নিজের, পরিবার-পরিজনের ও পোষ্যদের পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে হয়। যাকাতের তুলনায় সাদাকাতুল ফিতরের ক্ষেত্র অনেকটা বিস্তৃত। সাদাকাতুল ফিতর ব্যক্তিগত দান হলেও মহানবী স. এর যুগে তা আদায় করে দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হতো। কাজেই সাদাকাতুল ফিতর দারিদ্র্য বিমোচনে বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে।

৯. উদহিয়া

উদহিয়া অর্থ হচ্ছে কুরবানী। কুরবানীর গোশত যেমন আত্মীয়-স্বজন ও দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হয় তদ্রূপ কুরবানীর পশুর চামড়া-বিক্রিত অর্থ দারিদ্র্য বিমোচনের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। এ অর্থের অংক একেবারে ছোট নয়।

১০. নযর

নযর অর্থ মানত। মনোবাসনা পূরণে আল্লাহর উদ্দেশ্যে মানত করা হয়। মানতকারীর মনোবাসনা পূর্ণ হলে ঐ মানত আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। মানতের আদায়কৃত অর্থ দ্বারা দরিদ্র লোকজন উপকৃত হয়। মানত কখনো টাকায় আবার কখনো পশুর মাধ্যমেও আদায় করা হয়।

১১. হেবা

হেবা দানের অন্যতম একটি প্রক্রিয়া। হেবা দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে একটি ভালো উপায়। শরীআতে হেবা একটি অনুমোদিত বিষয় এবং তা মানুষের ইহ-পারলৌকিক জীবনে কল্যাণ সাধনেও অবদান রাখতে পারে।

১২. ওয়াক্‌ফ

ওয়াকফ বলতে কোন মুসলিম ব্যক্তি বৈধ উপায় উপার্জিত স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পদের থেকে মুসলিম উম্মাহ'র কল্যাণের জন্য স্বত্ব ত্যাগ পূর্বক দান করাকে বুঝায়। এই সম্পদ দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের অবদান রাখতে পারে।

১৩. ওয়াসিয়্যাত

মৃত্যুর পর সমাজ কল্যাণমূলক কাজে বা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে স্বীয় সম্পদের একাংশ দান করার ঘোষণা দেয়ার নাম ওয়াসিয়্যাত। মোট সম্পদের সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ ওয়াসিয়্যাত করা যাবে। মহানবী স. বলেছেন- "এক তৃতীয়াংশ ওয়াসিয়্যাত কর। কেননা এক তৃতীয়াংশ অনেক বেশি অথবা বড়"।[৪৪] কাজেই ওয়াসিয়্যাতের মাধ্যতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক সাহায্য নিশ্চিত করা যেতে পারে।

১৪. করযে হাসানা

যে ঋণ বিনা সুদে নিঃস্বার্থ ভাবে মানুষের কল্যাণের নিমিত্তে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে প্রদান করা হয় তাকে করযে হাসানা বলা হয়। এর মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের আর্থিক অসচ্ছলতা দূরীকরণে সহায়তা করা যায়।

১৫. হাদী

হজ্জ বা উমরা পালনকারী ইহরামের সময় ঘটে যাওয়া কোন নিষিদ্ধ কাজের কাফ্ফারা স্বরূপ বা হজ্জে কিরান বা হজ্জে তামাত্তু করার জন্য যে উট, গরু, বকরী ও অন্যান্য পশু কাবা শরীফে নিয়ে যায় তাকে 'হাদী' বলে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে মুমিনগণ ! ইহরামে থাকাকালে তোমরা শিকার-জন্তু হত্যা করো না; তোমাদের মধ্যকার কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করলে যা সে হত্যা করল তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যকার দুই জন ন্যায়বান লোক কাবাতে প্রেরিতব্য কুরবানী রূপে। অথবা তার কাফ্ফারা হবে দরিদ্রকে খাদ্যদান করা কিংবা সমসংখ্যক রোযা রাখা, যাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে"।[৪৫]

আল্লাহ তাআলা অভাবী লোকদের গোশত খাওয়ানোর জন্য এ কুরবানী বাধ্যতামুলক করে দিয়েছেন। অপর একটি আয়াতে এর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। "তোমরা তা হতে আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও যাঞ্চাকারী অভাবগ্রস্তকে। এ ভাবে আমি তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর"।[৪৬]

১৬. প্রতিবেশীর অধিকার আদায়

প্রতিবেশীর অধিকার আদায় করার বিষয়টি কুরআন ও হাদীসে বিশেষ তাকীদ সহকারে স্থান পেয়েছে। এমনকি প্রতিবেশীর অধিকার আদায়ের ব্যাপারে অবহেলা

করা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়ার নামান্তর বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না এবং পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিক ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না"।[৪৭]

মহানবী স. প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে বলেন, "সে ব্যক্তি মুমিন নয় যে তৃপ্তি সহকারে আহার করে আর তার পাশেই তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে"।[৪৮]

কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করলে যেমন সকল প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক নিবিড় হয় অপরদিকে বিশেষত দরিদ্র প্রতিবেশী তার দারিদ্র্য বিমোচনের খানিকটা সুযোগ লাভ করে।

১৭. ফসলের হক আদায়

কোন কৃষক তথা মালিক যখন তার ক্ষেতের ফসল তোলতে যায় তখন কোন যাচঞাকারী উপস্থিত থাকলে তাকে দান করা উচিত। আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে বলেন, "তিনিই লতা ও বৃক্ষ উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর গাছ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্য শস্য, যায়তুন ও দাড়িম্ব সৃষ্টি করেছেন। এগুলো একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করবে এবং ফসল তোলার দিনে তার হক প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না"।[৪৯]

ইবনে কাসীর র. বলেন, "যারা ফল-ফলাদি কাটার সময় দান-খয়রাত করেনা আল্লাহ তাদের নিন্দা করেছেন, যেমন সূরা-কালামে বর্ণিত আছে।[৫০]

কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দান-খয়রাত দ্বারা ক্ষেত-খামার বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পায় এবং অসচ্ছল লোকদের অভাব কিছুটা হলেও দূর হয়।

উপরোক্ত উপায়সমূহ কার্যকর করার মাধ্যমে ইসলামী সমাজে বিভিন্ন পর্যায়ের অসচ্ছল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মাঝে সম্পদ বন্টিত হতে পারে। ফলে দরিদ্র ব্যক্তিবর্গ সম্পদের মালিক হয়ে এক পর্যায়ে সাহিবে নিসাবও হতে পারে।

দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ

দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ-

১. আয় বৃদ্ধি

ইসলাম পরনির্ভরশীলতাকে নিরুৎসাহিত করে পক্ষান্তরে স্বনির্ভরতাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। কাজেই আয় বৃদ্ধি করার কাজ কষ্টসাধ্য হলেও ইসলাম তারই নির্দেশ দেয়। কুরআন-মাজীদে আছে-"নামায শেষ হলে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযক) সন্ধান করো"।[৫১]

মহানবী স বলেছেন, "অন্যান্য ফরযের পর হালাল উপার্জন অন্যতম ফরয"।[৫২] শ্রম-বিমুখ হয়ে পরনির্ভরশীল হয়ে থাকা মোটেও বাঞ্ছিত নয়। বরং নিজ হাতে আয় উপার্জন করা আল্লাহর নিকট উত্তম কাজ। বস্তুত কঠোর শ্রম ব্যক্তি ও জাতির ভাগ্যন্নোয়নের ক্ষেত্রে একান্ত সহায়ক পক্ষান্তরে অলসতা ও পরমুখাপেক্ষিতা দারিদ্র্য অনিবার্য করে তোলে। কাজেই হালাল উপায়ে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

২. ভিক্ষার হাত কর্মীর হাতে পরিণত করা

ইসলামে ভিক্ষাবৃত্তি অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। মহানবী স. বলেছেন– "যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ ! তোমাদের মধ্যকার কারো তার পিঠে বহন করে কাঠের বোঝা এনে বিক্রি করা কারো কাছে ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে উত্তম। কারণ সে যার কাছে যাচঞ্চা করেছে সে তাকে দিতেও পারে, নাও দিতে পারে"।[৫৩]

সুতরাং ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তিকে কোন অবস্থায়ই উৎসাহিত করে না, তবে শর্ত সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবকাশ রয়েছে। কেননা মহানবী স. বলেছেন: "হে কাবীসা ! তিন ব্যক্তি ব্যতীত কারো যাচঞ্চা করা হালাল নয়: (১) ঐ ব্যক্তি যে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, সে তার ঋণ পরিশোধ পর্যন্ত যাচঞ্চা করতে পারে তবে তারপর সে বিরত থাকবে; (২) ঐ ব্যক্তি বিপর্যয় যার ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দিয়েছে, সে তার মধ্যম পন্থায় জীবিকা নির্বাহের পরিমাণ যাচঞ্চা করতে পারবে এবং (৩) যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত এবং তার গোত্রের তিন ব্যক্তি তার সম্পর্কে এ সাক্ষ্য দেয় যে, সে ব্যক্তি অবশ্যই ক্ষুধার্ত। তার মধ্যম পন্থায় জীবিকা নির্বাহের পরিমাণ যাচঞ্চা করা হালাল। হে কাবীসা ! এই তিন ব্যক্তি ব্যতীত যে ভিক্ষা করে খায় সে হারাম খায়।"[৫৪]

৩. উপার্জনের সুযোগ অবারিত রাখা

দারিদ্র্য সমাজ-সভ্যতাকে এগিয়ে নেয়ার পরিবর্তে পিছিয়ে দেয়। জীবিকা উপার্জনের সুযোগ অবারিত না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে মানুষ দারিদ্র্য অবস্থায় নিপতিত হয়। এজন্য ইসলাম জীবিকা উপার্জনের লক্ষ্যে সুযোগ উন্মুক্ত রাখার পক্ষে। কেননা

কুরআন মাজীদে আছে– "যেন তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে"।[৫৫]

কাজেই কোন এলাকার জনগোষ্ঠী যদি অন্যদের চেয়ে অর্থনৈতিক দিক থেকে অধিক সচ্ছল হয় এবং কোন জনপদের অধিবাসী যদি পশ্চাদপদ হয়, এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জন্য শ্রম বাজার উন্মুক্ত করে দেয়া। এতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যেমন আসবে অনুরূপভাবে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার আকাশ-পাতাল ব্যবধানও কমে আসবে।

৪. সুষম বন্টন

কোন দেশে জনপ্রতি বার্ষিক আয় বিপুল পরিমাণ হলেও সে দেশে অসম বন্টন হওয়ার কারণে দারিদ্র্য অবস্থা বিরাজ করতে পারে। তাই বন্টনের ক্ষেত্রে সুষম বন্টন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অন্যথায় অন্যের উপর অবিচার করা হবে। অথচ আল্লাহ তাআলা সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন। "আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন"।[৫৬]

ন্যায়পরায়ণতা ছাড়াও উপকরণের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি মানবিক দিক রয়েছে, আর সেটা হচ্ছে 'শ্রম'। শ্রমের ক্ষেত্রে শ্রমিক ও মালিক ভাই ভাই সম্পর্ক স্থাপন ইসলামের দাবি। মহানবী স. তাই বলেছেন, "ওরা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাআলা ওদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। আল্লাহ যে ব্যক্তির অধীনে তার ভাইকে দিয়ে দেন, সে যা খায় তাকেও যেন তা খাওয়ায়, সে যা পরে, তাকেও যেন তা পরায় এবং এমন কাজের চাপ যেন তার উপর না দেয়, যা তার সাধ্যাতীত। আর যদি তার কাজের চাপ দেয়, তবে সেই কাজে নিজেও যেন তার সাহায্য করে।"[৫৭]

কাজেই সুষম বন্টন নিশ্চিত করা গেলে দারিদ্র্য অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

৫. মালিকানা নিয়ন্ত্রণ

যে সব সম্পদ জনস্বার্থে ব্যবহৃত হয় এবং যার মালিকানা ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে তার মালিকানা বেসরকারী খাতে দেয়া সমীচীন নয়। কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যেতে পারে। যেমন, যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরির কারখানা। রাষ্ট্র উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে জনগণের স্বার্থে বেসরকারী খাতের সংশ্লিষ্ট শিল্প কারখানা জাতীয়করণ করতে পারে।

৬. ব্যবসায়-বাণিজ্য

ইসলাম ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে নদী, সাগর ও মহাসাগরে নৌযানের মাধ্যমে মালামাল পরিবহণের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: "তিনিই সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করেছেন যাতে তোমরা তা থেকে তাজা মাছ আহার করতে পার এবং যাতে তা হতে আহরণ করতে পার রত্নাবলী যা তোমরা ভূষণরূপে পরিধান কর এবং তোমরা দেখতে পাও, তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে এবং তা এজন্য যে, তোমরা যেন তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর"।[৫৮]

মহানবী স. এবং তাঁর বিপুল সংখ্যক সাহাবী ব্যবসায়-বাণিজ্য করতেন। তিনি বলেন: "সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীরা নবী-সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে (কিয়ামতের দিন) থাকবে"।[৫৯]

মোটকথা, ব্যবসায়-বাণিজ্য করার মাধ্যমে মানুষ দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ অবদান রাখতে পারে।

৭. দারিদ্র্য বিমোচনের নেতিবাচক উপায়সমূহ দূরীকরণ

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় বাজার ব্যবস্থা হচ্ছে মৌলিক প্রতিষ্ঠান। চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমন্বয় বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। তাই বাজার যাতে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে সে জন্য ইসলাম কতিপয় সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অবৈধ অথচ দৃশ্যত লাভজনক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যেমন সুদ, ঘুষ, জুয়া, লটারী, মজুদদারী, চোরাচালান, ওজন ও পরিমাপে কম দেয়া, ভেজাল পণ্য বিক্রয়, পতিতাবৃত্তি, অশ্লীলতা প্রসারকারী ব্যবসায়-বাণিজ্য, মাদক দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসা, মূর্তি নির্মাণ ও ব্যবসা, ছিনতাই, লুণ্ঠন ইত্যাদি ইসলামী অর্থনীতিতে নিষিদ্ধ। এগুলো শোষণের হাতিয়ার এবং ত্বরিত সম্পদ কেন্দ্রীভূত করার অবৈধ কৌশল। এসব বিষয়ে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। কাজেই এসব অবৈধ পন্থা পর্যায়ক্রমে দূরীকরণ সম্ভব হলে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম বেগবান করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বিশেষত প্রচলিত সুদভিত্তিক অর্থনীতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আরো দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ফলে সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তাই ইসলাম সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে অর্থনৈতিক ভারসাম্য আনয়নের পথনির্দেশনা দিয়েছে।

উপসংহার

মানব জীবনে যত সমস্যা প্রতিনিয়ত আমাদের তাড়া করে তন্মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যা অন্যতম। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মহামন্দা সত্ত্বেও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সংস্থা অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাদের পরিচালিত কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য কোন অবদান রাখতে পারছে বলে দাবি করা যাচ্ছে না। পক্ষান্তরে ইসলাম যেহেতু পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান তাই তার মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান তথা দারিদ্র্য বিমোচনের সঠিক সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে– এ প্রত্যাশা একান্তভাবে যুক্তিসংগত। কেননা মহানবী স. পৃথিবীতে এমন এক মিশন নিয়ে এসেছিলেন যার উদ্দেশ্য ছিল সন্ত্রাস, নিরাপত্তাহীনতা ও দারিদ্র্য মুক্ত একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। মহানবী স. তাঁর সেই মিশন পূর্ণ করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র-সীমানা থেকে দারিদ্র্য বিদায় নিয়েছিল। দ্বিতীয় খলীফা উমর রা.-এর খিলাফতকালেই এই সফলতা আরো মাত্রা পায় এবং খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয র.-এর শাসনামলে দারিদ্র্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়, এমনকি কোন অভাবী মানুষ খুঁজে পাওয়া যেত না।

কাজেই যারা বলে, দারিদ্র্য বিমোচনের কোন উপায় নেই এবং ইসলাম যাকাতের বিধান দিয়ে দারিদ্র্য লালন করতে চায়, তাদের অভিমত অমূলক। সুতরাং প্রবন্ধে প্রস্তাবিত বিষয়গুলো যদি সমাজে নিষ্ঠা ও সততার সাথে কার্যকর করা যায় তবে পর্যায়ক্রমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব হবে।

তথ্যনির্দেশ

১. মানিক, নূরুল ইসলাম (সম্পাদিত), *দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃ. ৩২১

২. মাসুম, প্রফেসর ড. আবদুল লতীফ (সম্পাদিত) , *এক বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ সার্বিক উন্নয়ন সমীক্ষা* , ঢাকা : বাংলা বাজার, ২০০১, পৃ. ৭৩৩-৭৩৪

৩. আল কুরআন, ৯:৬০

৪. আল কারযাভী, ড. ইউসুফ, *ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা*, ঢাকা : সৃজন প্রকাশনী লিঃ, ১৯৯৯, পৃ. ৮০

৫. আবুল 'আলা, সৈয়দ, *ইসলামী অর্থনীতি*, ঢাকাঃ সৈয়দ আবুল আ'লা রিসার্চ একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ২৪৩

৬. আল কাসানী, আলাউদ্দীন আবু বকর ইবনে মাসউদ, *বাদাইউস সানাই ফী তারতীবিশ*

শারাই, বৈরূতঃ দারু ইহ্য়াউত তুরাসিল আরবী, ১৯৮২, ২ খ., পৃ. ১৫০

৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৯৪, পৃ. ১১

৮. নাসায়ী, ইমাম, *আস সুনান*, অধ্যায় : আল ইস্তিআযাহ, অনুচ্ছেদঃ আল ইস্তিআযাতু মিনাল ফাক্‌র, আল কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদঃ দারুসসালাম, ২০০০, হাদীস নং ৫৩৬৭, পৃ. ২৪৩৭

৯. আল কারযাভী, ড. ইউসুফ, *ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন*, ঢাকাঃ সেন্টাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ১৭

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

১১. আল কুরআন, ২৪:৩৩

১২. আল কুরআন, ১৭ : ৩১

১৩. বুখারী, ইমাম, *আস সহীহ*, অধ্যায় : আত তাওহীদ, অনুচ্ছেদ : ফালা তাজ'আলু লিল্লাহি আনদাদান . . . , আল কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদঃ দারুসসালাম, ২০০০, হাদীস নং ৭৫২০, পৃ. ৬২৭

১৪. হোসাইন, আবুল, *দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দরিদ্রদের ব্যবস্থাপনা*, ঢাকাঃ বাংলাবাজার, ২০০৮, পৃ. ৮

১৫. আসহাবে সুফফাঃ 'সুফ্‌ফা' অর্থ শামিয়ানা, চত্বর অথবা এমন একটি উঁচু স্থান যা ঘাস, খড় বা গাছের পাতার ছাউনি দ্বারা আচ্ছাদিত। একদল নিঃস্ব মুহাজির সাহাবী মসজিদে নববীর উত্তর দেয়াল সংলগ্ন চত্বরে ছাপড়া স্থাপন করে বসবাস করতেন। পরবর্তীকালে এ স্থানটি সুফ্‌ফা এবং এখানে অবস্থানকারী সাহাবীগণ 'আসহাবে সুফ্‌ফা' নামে খ্যাতি লাভ করেন। সুফ্‌ফায় অবস্থানকারী সাহাবীদের সংখ্যা ছিল প্রায় চারশত। (অধ্যাপক এটিএম মুছলেহউদ্দীন ও অন্যান্য (সাম্পাদিত), সীরাত বিশ্বকোষ, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, খ. ৫, পৃ. ৪৮১-৮৩

১৬. আল কারযাভী, ড. ইউসুফ, *ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

১৭. আল কুরআন, ২৮ : ৭৭

১৮. আল কুরআন, ৬৭ : ১৫

১৯. আল কুরআন, ৬২ : ১০

২০. বুখারী, ইমাম, *আস সহীহ*, অধ্যায় : আল বুয়ু, অনুচ্ছেদ : কাসবুর রাজুলি ওয়া আমালিহি বি ইয়াদিহি,, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২০৭৪, পৃ. ১৬২

২১. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২০৭২, পৃ. ১৬২

২২. আল কুরআন, ৮:৭৫

২৩. আল কুরআন, ২৭ : ৯০

২৪. আল কুরআন, ৩০: ৩৮

২৫. বুখারী, ইমাম, *আস সহীহ,* অধ্যায় : আল 'আদাব, অনুচ্ছেদঃ মান ওয়াসালা ওয়াসালা হুল্লাহ. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৯৮৮, পৃ. ৫০৭

২৬. হায়সামী, নুর উদ্দীন আলী, *মাযমাউয যাওয়াইদ ওয়ামাউল ফাওয়াইদ,* অধ্যায় : আল বিররি ওয়াস সিলাহ্, অনুচ্ছেদ : সিলাতুর রিহ্ম ওয়া কাতআহা, বৈরূত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, ১৯৮৮, খ. ৮, পৃ. ১৫০

২৭. আল কুরআন, ২ : ২৩৬

২৮. আল কারযাভী, ড. ইউসুফ, *ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

২৯. বুখারী, ইমাম, *আস সহীহ,* অধ্যায় : আয যাকাত, অনুচ্ছেদ : ওয়াজুবুয যাকাত. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৩৯৫, পৃ. ১০৯

৩০. তাবারী,, ইমাম, *তাফসীরে তাবারী,* আল কাহেরা : তা.বি. খ. ১৪, পৃ. ১৫৩

৩১. আল কুরআন, ৪০: ৬-৭

৩২. বুখারী, ইমাম, *আস সহীহ,* অধ্যায়ঃ আয যাকাত, অনুচ্ছেদঃ ওয়াজুবুয যাকাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৩৯৫, পৃ. ১০৯

৩৩. আল কুরআন, ২২ : ৪১

৩৪. বুখারী, ইমাম, *আস সাহীহ,* অধ্যায়ঃ আয যাকাত, অনুচ্ছেদঃ ওয়াজুবুয যাকাত; প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৩৯৫, পৃ. ১০৯

৩৫. আল কুরআন, ৫৯ : ৭

৩৬. মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, মওলানা, *আল কুরআনে অর্থনীতি,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০, পৃ. ৫৯৮

৩৭. আল্লাহ বলেনঃ "সাদাকা (যাকাত) কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ-ভারাক্রান্তদের এবং, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এ হচ্ছে আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়"। (আল কুরআন, ৯:৬০)

৩৮. আল কুরআন, ২: ২৬৭

৩৯. আবু দাউদ, ইমাম, *আস সুনান,* অধ্যায় : আয যাকাত, অনুচ্ছেদ : সাদাকাতুয যারআ, আল কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদঃ দারুসসালাম, ২০০০, হাদীস নং ১৫৯৬, পৃ. ১৩৪২

৪০. সিদ্দিকী, ড. ইয়াসীন মাযহার, *রাসূল মুহাম্মদ (স) -এর সরকার কাঠামো* ,ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪, পৃ. ১৪১

৪১. আল কুরআন, ৫ : ৮৯

৪২. আল কুরআন, ২: ১৮৪

৪৩. আল কুরআন, ৪: ৪

৪৪. বুখারী, ইমাম, *আস সহীহ,* অধ্যায় : আল ওয়াসাআ, অনুচ্ছেদ : আল ওয়াসিয়্যাতু বিস সুলুস, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৭৪৩, পৃ. ২২০

৪৫. আল কুরআন, ৫:৯৫

৪৬. আল কুরআন, ২২: ৩৬

৪৭. আল কুরআন, ৪ : ৩৬

৪৮. ওয়ালী উদ্দীন, শায়খ, *আল মিশকাতুল মাসাবীহ,* অধ্যায় : আল আদাব, অনুচ্ছেদ : আশ-শুফকাতু ওয়ার রহমাতু আলাল খাল্ক, আল কায়েরা : তা.বি. পৃ. ৩১৯

৪৯. আল কুরআন, ৬: ১৪১

৫০. আল কুরআন, ৬৮: ১৭, সূত্র ইবনে কাসীর, খ. ২, পৃ. ১৮১-১৮২

৫১. আল কুরআন, ৬২:১০

৫২. ওয়ালী উদ্দীন, শায়খ, *আল মিশকাতুল মাসাবীহ,* অধ্যায় : আল বুয়ূ, অনুচ্ছেদ আল-ফাসলুস সালিস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১

৫৩. বুখারী, ইমাম, *আস সহীহ,* অধ্যায় : আয যাকাত, অনুচ্ছেদ : আল ইস্তিফাফ আনিল মাসআলাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৪৭০, পৃ. ১১৬

৫৪. মুসলিম, ইমাম, *আস সহীহ,* অধ্যায় : আয যাকাত, অনুচ্ছেদ : মান তাহিল্লু লাহুল মাসআলাহ, হাদীস নং ১০৪৪, পৃ. ৮৪২

৫৫. আল কুরআন, ৫৯ : ৭

৫৬. আল কুরআন, ১৬: ৯০

৫৭. বুখারী, ইমাম, *আস সহীহ,* অধ্যায় : আল আদাব, অনুচ্ছেদ : মা ইউনহা মিনাস সিবাবি ওয়াল লা'আন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬০৫০, পৃ. ৫১১

৫৮. আল কুরআন, ১৬ : ১৪

৫৯. তিরমিযী, ইমাম, *জামে আততিরমিযী,* অধ্যায় : আল বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ. ফিত-তুজ্জার, আল কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, হাদীস নং ১২০৯, পৃ. ১৭৭২

৬০. আবদুল মাবুদ, ড. মুহাম্মদ, *উমার ইবন আবদিল আযীয (রহ),* ঢাকা : বাংলাদেশে ইসলামিক সেন্টার, ২০০৬, পৃ. ৯০

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ ৭, সংখ্যা ২৫
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১১

ইসলামে চুক্তি আইন : একটি পর্যালোচনা

ড. মোঃ মাসুদ আলম*
মুহাম্মদ জাহিদ ইসলাম**

[সারসংক্ষেপ : ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এতে রয়েছে মানবজীবনের সকল বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা। মানবজীবনের প্রতিটি বিভাগই কোন না কোন পর্যায়ে আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সর্বোপরি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের বিভিন্ন আইনের মধ্যে 'চুক্তি আইন' অন্যতম। চুক্তি আইনের মাধ্যমে দুই বা ততোধিক পক্ষ নির্বিঘ্নে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের নিশ্চয়তা লাভ করে। চুক্তি আইন সম্পর্কে ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট নীতিমালা। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে চুক্তি আইনের পরিচয়, পদ্ধতি, চুক্তির শর্তাবলী, চুক্তির বিষয়বস্তু, চুক্তির শ্রেণীবিভাগ, চুক্তি আইনে প্রতিনিধিত্ব, প্রতিনিধিত্বের সীমা, প্রতিনিধির ভূমিকা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সী বাতিল, সিওরিটি বা গ্যারান্টি চুক্তি, ঋণ পরিশোধ চুক্তি ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হয়েছে।]

চুক্তি আইনের পরিচয়

চুক্তি বাংলা শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ- শর্ত। চুক্তির আরবি শব্দ আক্দ (العقد) যা ইংরেজীতে ব্যবহৃত কন্ট্রাক্ট (Contract) শব্দের প্রতিরূপ। এর অর্থ সংযোগ বা বন্ধন। 'আক্দ' শব্দটির উল্লেখ আল-কুরআনে রয়েছে। যেমন- আল্লাহ্ বলেন, "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ (চুক্তিসমূহ) পূর্ণ কর।"[১] চুক্তি অর্থ- একত্রীকরণ। চুক্তি করতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে মতৈক্যের প্রয়োজন হয়। তবে সেই মতৈক্য আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। আমাদের দেশে প্রচলিত ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের দুই(জ) ধারায় চুক্তির সংগা দেয়া হয়েছে এভাবে- আইন দ্বারা কার্যকর করা যায় এমন সম্মতিকে চুক্তি বলা হয়। (An agreement enforceable by law is a contract.) স্যার উইলিয়াম এ্যানসন (William Anson) চুক্তির সংগা

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

প্রসঙ্গে বলেন, আইনের দ্বারা বলবৎযোগ্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত যে সম্মতির দ্বারা একপক্ষ অন্য পক্ষের কার্য বা কার্য হতে বিরত থাকবার অধিকার লাভ করে থাকে তাকে চুক্তি বলে।[২] আইন শাস্ত্রে চুক্তি হলো দ্বিমুখী লেনদেন। এই চুক্তি গ্রহণযোগ্য হতে হবে। তা সাধারণত চুক্তির সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষের মধ্যে একই বৈঠকে (অধিবেশন, মজলিস) অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে চুক্তি হওয়ার জন্যে দু'টি পক্ষের প্রয়োজন। একপক্ষ ঘোষণা করবে; অন্যপক্ষ তা গ্রহণ করবে। অর্থাৎ উভয়ের মতামত এক এবং ঘোষণাও একই বিষয়ের উপর হতে হবে, চুক্তির দ্বারা একটি বৈধ ফলের সৃষ্টি হবে। প্রস্তাব করা ও প্রস্তাব গ্রহণ চুক্তির শ্রেষ্ঠ উপাদান, যার অনুপস্থিতিতে চুক্তি হতে পারে না।[৩]

চুক্তির পদ্ধতি

মহানবী হযরত মুহাম্মদ স.-এর মদীনা জীবনের শেষ পর্যায়েই আর্থিক লেনদেনের চুক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করে রাখার গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলী প্রদত্ত হয়েছে। এ বিষয়ে আল-কুরআনে নির্দেশ এসেছে- "হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণের আদান প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দিবে; লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। আল্লাহ্ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেয়া। ঋণ গ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহ্কে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দু মাত্রও বেশ-কম না করে। অতঃপর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখবে। দু'জন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর- যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন ডাকা হয়, তখন সাক্ষীদের অস্বীকার করা উচিত নয়। বিরক্ত হয়ো না, তা ছোট হোক কিংবা বড়, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এ লিপিবদ্ধকরণ আল্লাহ্র কাছে সুবিচারকে অধিক কায়েম রাখে, সাক্ষ্যকে অধিক সুসংহত রাখে এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত। কিন্তু যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পর হাতে হাতে আদান-প্রদান কর, তবে তা না লিখলে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই। তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ। কোন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না। যদি তোমারা এরূপ কর, তবে তা তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। আল্লাহ্কে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ্ সব কিছু জানেন"।[৪]

আল-কুরআনের এ আয়াতে ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পর্কিত আইনের জরুরী মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে, যাকে চুক্তিনামাও বলা যেতে পারে। এরপর সাক্ষ্যবিধির বিশেষ ধারা উল্লেখিত হয়েছে। আজকাল লেখালেখির যুগ। লেখাই মুখের কথার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ১৪০০ বছর পূর্বের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় তখন দুনিয়ার সব কাজ-কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্য মুখে মুখেই চলতো। লেখালেখি এবং দলীল-দস্তাবেজ তথা চুক্তিনামার কোন প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম কুরআন পাক এ দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যা পূর্বোক্ত আয়াতে বিবৃত হয়েছে।

উক্ত আয়াতে ব্যবসায়ী চুক্তির যে প্রধান দু'টি নীতিমালা বিবৃত হয়েছে তা হলো–

এক. ধার-কর্জের লেন-দেনে দলীল-দস্তাবেজ লিপিবদ্ধ করা উচিত, যাতে ভুল ভ্রান্তি অথবা কোন পক্ষ থেকে অস্বীকৃতির কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তখন কাজে লাগে।

দুই. ধার কর্জের ব্যাপারে মেয়াদ অবশ্যই নির্দিষ্ট করতে হবে। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার-কর্জের লেন-দেন জায়েয নয়। এতে কলহ-বিবাদের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এ কারণেই ফিকহ্‌বিদগণ বলেছেন: মেয়াদ এমন নির্দিষ্ট করতে হবে, যাতে কোন রূপ অস্পষ্টতা না থাকে। মাস এবং দিন তারিখ নির্দিষ্ট করতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্ট মেয়াদ, যেমন 'ধানকাটার সময়' নির্ধারণ করা যাবে না। কেননা আবহাওয়ার পরিবর্তনে ধানকাটার সময় আগে-পিছে হয়ে যেতে পারে। যেহেতু সেযুগে লেখার ব্যাপক প্রচলন ছিল না এবং আজও ব্যাপক প্রচলনের পর পৃথিবীর অধিকাংশ লোক লেখা জানে না, তাই সম্ভাবনা ছিল যে, লেখক কিসের স্থলে কি লিখে ফেলবে। ফলে কারো ক্ষতি এবং কারো লাভ হয়ে যাবে। এ সম্ভাবনার কারণেই অতঃপর বলা হয়েছে- وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ অর্থাৎ, "এটা জরুরী যে, তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখবে।" এতে একদিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, লেখক কোনো একপক্ষের লোক হতে পারবে না; বরং নিরপেক্ষ হতে হবে যাতে কারো মনে সন্দেহ না থাকে। অপরদিকে লেখককে ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যের ক্ষণস্থায়ী উপকার করে নিজের চিরস্থায়ী ক্ষতি করা তার পক্ষে উচিত হবে না। এরপর লেখককে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে লেখার বিদ্যা দান করেছেন। এর কৃতজ্ঞতা এই যে, সে লিখতে অস্বীকার করবে না।[৫]

মুসলিম আইনে চুক্তি করার জন্যে সাধারণত কোন আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন পড়ে না। প্রত্যেক পক্ষের চুক্তির অনুকূলে ঘোষণা দানই প্রয়োজনীয় শর্ত। প্রথম যে ঘোষণা দেয়া হবে তা হল, প্রস্তাব উপস্থাপন আর দ্বিতীয় উপস্থাপিত প্রস্তাব গ্রহণ। বাস্তবতার ভিত্তিতে অথবা আইন যেভাবে বলে সেভাবে একই বৈঠকে প্রস্তাব উথাপন এবং উত্থাপিত প্রস্তাব গ্রহণ সম্পন্ন হবে।[৬] ধরা যাক, কোন এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে তার নিকট একটি ঘোড়া বিক্রির প্রস্তাব দিল কিন্তু সংশ্লিষ্ট লোক (বিক্রেতা) প্রস্তাব গ্রহণ করল না এবং সে বিদায় নিল। তখন সে প্রস্তাবের সেখানেই সমাপ্তি ঘটবে। কেননা এ প্রস্তাব পালনে মালিকের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যদি বিক্রির প্রস্তাব পত্রবাহক বা চিঠির মাধ্যমে পাঠান হয় তাহলে প্রস্তাব গ্রহণের স্থান ও সময়, যার নিকট প্রস্তাব পাঠান হয়েছে তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হবে।

চুক্তির শর্তাবলী

আইনসম্মত অন্যান্য কাজের ন্যায় চুক্তির বৈধতা চুক্তিকারী ব্যক্তির যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। চুক্তিকারী কোন ব্যক্তির প্রয়োজনীয় সামর্থ্য না থাকলে একই সঙ্গে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।[৭] একজন লোকের উপর তার কাজের জন্য আইনের শাসন প্রয়োগ করা গেলে তাকে বলা হবে বৈধ যোগ্যতা। এ বৈধ যোগ্যতাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়:

১. অধিকার আদায়ের যোগ্যতা ও
২. কর্তব্য পালনের যোগ্যতা।

প্রথমটির যোগ্যতা নির্ভর করে একটি শিশুর জন্মের পর থেকেই; কিন্তু দ্বিতীয়টির পূর্ণতা নির্ভর করে যখন শিশুটি প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন, স্বাধীন ও ইসলাম ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী এবং মারাত্মক অসুস্থতা বা ঋণদায়গ্রস্ততা থেকে মুক্ত থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট বালকটি পনের বছরে উপনীত হলেই তার দৈহিক পরিপক্কতা অথবা দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্পিত হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। আর দ্বিতীয়টির যোগ্যতা অর্জিত হয় প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর।[৮]

চুক্তির বিষয়বস্তু

ইসলামী আইনে চুক্তির প্রধান বিষয়বস্তু হবে নিম্নরূপ–

১. চুক্তির বিষয়বস্তু এমন হতে হবে যে, চুক্তি কার্যকর করার জন্য বিষয়টি হস্তান্তর করা যাবে। যেমন, ডুবন্ত একটি জাহাজ যা পানির তলা থেকে উঠান সম্ভব নয়

বা একটি জন্তু যা ধরা যায় না এবং হস্তান্তর করা যায় না সে ক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

২. এটি হবে বিশেষ ধরনের বস্তু এবং চুক্তিকারী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সুবিদিত।

৩. বাস্তবে এর অস্তিত্ব থাকতে হবে।

৪. ইসলামী আইনে চুক্তিটি জায়েয হতে হবে। যেমন শূকরের গোশ্ত , মদ ও সুদ যা ইসলামে নাজায়েয ঘোষণা করা হয়েছে, তা মুসলিম আইনে চুক্তির বিষয়বস্তু হতে পারবে না।[৯]

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, মুসলিম আইনবিদগণের মতে (Muhammadan Jurists) কোন কিছুর মালিকানা হস্তান্তরের সময় মালিক কর্তৃক এর হস্তগত বা বাহ্যিক হস্তান্তর নিষ্পন্ন হতে হবে। আইনশাস্ত্রের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এ ধারণা সম্প্রসারণশীল সমাজের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্যে জুড়ে দেয়া হয়েছে যা আজও সম্পত্তি আইনে হস্তান্তর ও পরিচালনা সম্পর্কিত আইনে প্রত্যক্ষ করা যায়। এখানে যেমন লীজ (Leage) এবং ভাড়া দেয়াকে ভবিষ্যতে দেয় সুদের বিনিময়ে অন্যের সম্পত্তি দখল করাকে বোঝান হয়েছে তেমনি বায় সালাম[১০] এবং ইস্তি সনাকে[১১] চুক্তির সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলে ধরা হয়েছে। সম্পত্তি জাতীয় কোন কিছু স্বেচ্ছায় হস্তান্তরের বেলায়ও এ ধারণা বিদ্যমান। দান বা ওয়াক্ফ জাতীয় চুক্তির বিষয়বস্তুটি হস্তান্তরের সময় বাস্তব হতে হবে এবং দাতা তাৎক্ষণিক তার মালিকানার স্বার্থ ত্যাগ করতে বাধ্য থাকবে[১২]।

চুক্তিটিতে কোন ভুল-ভ্রান্তি, ভুল উপস্থাপনা, ছল-চাতুরী, জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতার কিছু থাকবে না। কোন বস্তু বিক্রির বেলায় দ্রব্য ক্রয় শেষ হয়ে গেলে বা বস্তু সরবরাহ হয়ে গেলেও দর কষাকষির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলোকে প্রত্যক্ষ দেখা বা ত্রুটির সুযোগ বলা যাবে অর্থাৎ ক্রেতা যদি ক্রয়ের সময় জিনিসটি না দেখে থাকে বা যদি দেখেও থাকে এবং পরে এর ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে ক্রেতা দর কষাকষি বাতিল করে দিতে পারে। কিন্তু এখানে যা দেখতে হবে তা হলো ক্রেতার উপর কোন চাতুরী করা হলো কিনা বা একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই ত্রুটিটি ধরা যেত কিনা এটা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। যা বিবেচ্য, তা হলো ক্রেতা যা ক্রয়ের জন্যে রাযী হয়েছিল তা সে পেল কিনা,যদি সে ঐসব ত্রুটিসহ বস্তুটি ক্রয় করে তাহলে তার কোন বাছাইকরণের অধিকার থাকবে না।[১৩]

চুক্তির শ্রেণীবিভাগ

মুসলিম আইনের মূল বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিকোণ থেকে চুক্তির নিম্নরূপ শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে–

১. বৈধভাবে সম্পত্তির অধিকার হস্তান্তর চুক্তি। যেমনঃ
   (ক) বিনিময়ের নিমিত্তে সম্পত্তির হস্তান্তর চুক্তি (ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি);
   (খ) অবিনিময়ের নিমিত্তে চুক্তি। যেমন, হিবা বা সাধারণ দান;
   (গ) উৎসর্গের জন্যে চুক্তি। যেমন, ওয়াক্ফ চুক্তি;
   (ঘ) উত্তরাধিকারের চুক্তি। যেমন, উইলের মাধ্যমে সম্পত্তি প্রদান চুক্তি।

২. অন্যায়ভাবে সম্পত্তির অধিকার হস্তান্তর চুক্তি। যেমন–
   (ক) বিনিময়ের নিমিত্তে সম্পত্তি ইজারা– অর্থাৎ ভাড়া দেয়ার জন্যে স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি; দ্রব্য পরিবহন, সম্পত্তির নিরাপদ যিম্মাদারী, পারিবারিক ও পেশাগত সেবার জন্যে বিভিন্ন বিষয়ে কাজ এর অন্তর্ভুক্ত।
   (খ) সম্পত্তির বিনিময়ে নয় যেমন, ঋণ-এর জমার ব্যবস্থা।

৩. (ক) কোন বাধ্যবাধকতা পালনের চুক্তি। যেমন, বন্ধক ও জামানত।
   (খ) এজেন্সি বা অংশীদারি কারবারে প্রতিনিধিত্ব প্রদানের জন্য।

৪. বৈবাহিক কাজকর্ম হস্তান্তর চুক্তি।[১৪]

উপরোক্ত চুক্তিসমূহের মধ্যে বিক্রয়চুক্তি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সমাজের সকল মানুষই ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে কোন না কোনভাবে সম্পৃক্ত।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের চুক্তি

এজেন্সির আরবী পরিভাষা ওয়াকালা। নিজে অন্য কারো স্থলে ব্যবসায় কর্মে অন্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার নামই ওয়াকালাত। যে প্রতিনিধিত্ব দান করবে তাকে ওয়াকিল (Wakil) বা এজেন্ট বলা হয়। ব্যবসায়ের যে আসল মালিক তাকে বলা হয় মুয়াক্কিল বা প্রিন্সিপাল বা মালিক। ইসলামে চুক্তি প্রস্তাব করা এবং প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে ওয়াকালা সম্পাদিত হয়।[১৫]

প্রতিনিধিত্বের সীমা

প্রতিনিধিত্ব সকল প্রকারের ব্যবসায়েই স্বীকৃত । যেমন ক্রয়- বিক্রয়, ভাড়া দেয়া, ভাড়া গ্রহণ, ধার গ্রহণ, অঙ্গীকারের মাধ্যমে ধার দেয়া, জামিন রাখা, কোন কিছু দান করা, অব্যাহতি প্রদান, মামলা করা, অগ্রাধিকারের দাবি, পিটিশন, ঋণ পরিশোধ, বিবাহ চুক্তি, সম্পত্তি দখল ইত্যাকার বিষয়াবলি। আইনের দৃষ্টিতে এমন কোন

প্রতিনিধিত্ব স্বীকৃত নয় যাতে মালিকের ক্ষমতা খর্ব হতে পারে। অর্থাৎ এখানে অন্যায়ভাবে কোন প্রতিনিধিত্ব থাকতে পারে না, যেখানে অপরাধী শুধু অন্যের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে ও কথা বলে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করতে পারে।[১৬]

পণ্যদ্রব্যের ঋণের বেলায় অঙ্গীকারের মাধ্যমে ধার দেয়া, জামিন রাখা, ঋণ প্রদান, অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ব্যবসায়, মুদারাবার (যৌথ অংশীদারিত্ব) ক্ষেত্রে যদি এজেন্ট বা প্রতিনিধি স্পষ্টভাবে মালিকের সাথে চুক্তি না করে থাকে তাহলে সে (প্রতিনিধি) কার্যকলাপের জন্যে মালিকের নিকট দায়বদ্ধ থাকতে পারবে না। কিন্তু বিক্রয়ের বেলায় বা আংশিক অর্থ প্রত্যয়ণপূর্বক ঋণ পরিশোধের চুক্তিতে মালিকের স্পষ্ট হওয়ার প্রয়োজন নেই। এ ক্ষেত্রে মালিকই চুক্তির সুবিধা ভোগ করবে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। প্রতিনিধি চুক্তিকারী পক্ষ বলে বিবেচিত হবে এবং চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল দায়-দায়িত্ব তার উপরই বর্তাবে। অন্যথায় অধিকার বা দাবির বাধ্যবাধকতা মালিক ও প্রতিনিধি উভয়ের উপরই পড়বে।[১৭]

প্রতিনিধি নিয়োগ বা প্রতিনিধির ভূমিকা পালন

আইনের দৃষ্টিতে সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ককেই প্রতিনিধি নিয়োগ করা যেতে পারে।

যে কেউ প্রতিনিধি হতে পারে, কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক বা মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাবে না যাকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা যায় না। কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে যদি প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয় তাহলে তাকে অবশ্যই মালিক এবং তৃতীয় কোন ব্যক্তির সাথে চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সে মালিকের নিকট দায়ী থাকবে না এবং যে দায়িত্ব সে গ্রহণ করেছে তার জন্যে সে মালিকের নিকট দায়ী থাকবে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, নিজের দায়িত্বেই সে অপ্রাপ্তবয়স্ক প্রতিনিধি নিয়োগ করবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক প্রতিনিধির অব্যবস্থাপনার দ্বারা যদি তার সম্পত্তির কোন লোকসান হয়ে থাকে তাহলে সে তার নিকট থেকে কোন ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে না।[১৮]

প্রতিনিধির প্রকারভেদ

প্রতিনিধিত্বের প্রকার নিম্নরূপ হতে পারে–

১. কর্তৃত্বের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব : এটা চুক্তিভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব নামেও পরিচিত। চুক্তির স্বার্থে সংশ্লিষ্ট কর্তৃত্ব স্পষ্ট বা অস্পষ্ট দু'টোই হতে পারে। কর্তৃত্বকে স্পষ্ট

বলা যাবে যদি তা মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে হয়ে থাকে। যদি অবস্থার প্রেক্ষিতে কর্তৃত্ব নির্ধারিত হয়ে থাকে তাকে অস্পষ্ট বলা হবে।

২. অনুমোদনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব : এ জাতীয় প্রতিনিধিত্বের সৃষ্টি হয় যখন কোন ব্যক্তি অজ্ঞাতে বা বিনা অনুমতিতে অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষ হয়ে কোন কাজ করে। পূর্ব কর্তৃত্বের জন্যে আইনের অনুমোদন প্রয়োজন। যখন এ জাতীয় প্রতিনিধিত্ব অনুমোদিত হবে তখন মালিকের ক্ষতির জন্যে হোক বা সুবিধার জন্যে হোক মালিককে তা মেনে নিতে হবে।[১১]

মালিকের প্রতি প্রতিনিধির দায়িত্ব
মালিকের উপর প্রতিনিধির নিম্ন বর্ণিত দায়িত্ব থাকবে–

১. মালিকের দেয়া শর্তানুসারে প্রতিনিধি তার ব্যবসায় পরিচালনা করতে বাধ্য। মালিকের পক্ষ থেকে কোন শর্ত না থাকলে ব্যবসার স্থানে যে রীতিনীতি প্রচলিত তাই প্রতিনিধি মানতে বাধ্য থাকবে। প্রতিনিধি যদি তা না পারে তাহলে মালিককে প্রতিনিধি যা ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

২. যে ব্যবসার জন্যে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়েছে একই রকম ব্যবসায়ে মানুষের যে স্বাভাবিক দক্ষতা থাকে তার মাধ্যমে সে ব্যবসায় পরিচালনা করতে বাধ্য। প্রতিনিধির অদক্ষতা সম্পর্কে মালিকের জানা না থাকলে অদক্ষতার কারণে ব্যবসায়ে লোকসান হলে মালিককে প্রতিনিধির ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

৩. প্রয়োজনে প্রতিনিধি মালিককে যথার্থ হিসাব দিতে বাধ্য থাকবে।

৪. সমস্যা দেখা দিলে প্রতিনিধি তার মালিকের সাথে যোগাযোগ করে নির্দেশনা গ্রহণ করবে, যদি কোন যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়াই সে নির্দেশ গ্রহণে অপারগ হয় এবং এ অপারগতার জন্যে ব্যবসায় লোকসান হয় তাহলে সে মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

৫. নির্ধারিত কমিশন বা সম্মানী ব্যতীত তার উপর ন্যস্ত ব্যবসায় বা লেনদেন থেকে উভয়ের মধ্যে চুক্তি বহির্ভূত কোন মুনাফা প্রতিনিধি গ্রহণ করতে পারবে না। প্রতিনিধির মাধ্যমে যত মুনাফা অর্জিত হবে মালিক তার অধিকারী হবে।

৬. মালিকের সম্মতি ব্যতীত প্রতিনিধি নিজ দায়িত্বে এজেন্সী বা ব্যবসায় কারবারের প্রধান পক্ষ হতে পারবে না।

৭. সাধারণ নিয়ম অনুসারে মালিকের স্পষ্ট মঞ্জুরী বা স্ববিবেচনাপ্রসূত ক্ষমতা ব্যতীত একজন প্রতিনিধি উপ-প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে পারবে না।[২০]

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সি বাতিল

প্রতিনিধি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দেয়া বা মালিক কর্তৃক প্রতিনিধিকে অপসারণ করার উল্লেখযোগ্য তিনটি বিধান নিম্নরূপ–

১. যখন ইচ্ছা মালিক প্রতিনিধিকে অপসারণ করতে পারে কিন্তু প্রতিনিধি তার অপসারণের নোটিশ না পাওয়া পর্যন্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে তার স্বাভাবিক কাজকর্ম চালু রাখবে। অনুরূপভাবে প্রতিনিধি যখনই ইচ্ছা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে সরে যেতে পারে।

২. মালিক যদি মারা যায় বা জড়বুদ্ধি হয়ে যায় বা স্বধর্ম ত্যাগ করে তাহলে প্রতিনিধির কমিশন বাতিল হয়ে যাবে। কেননা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কমিশন এমন নয় যে, তা প্রত্যাহার করা যায় না বা লংঘন করা যায় না, যেহেতু তা মালিকের আওতাধীনে এবং প্রতিনিধির সম্মতি ব্যতিরেকেই তাকে বরখাস্ত করা যেতে পাবে।

৩. অন্যদের উত্তরাধিকারের কথা বলতে গেলে উদাহরণস্বরূপ বলতে হয় যে, কোন ঋণ গ্রহীতা যদি তার সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে থাকে আর চুক্তির সময় বা ঋণ পরিশোধের সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয়ের জন্যে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়, তাহলে বন্ধক গ্রহীতার সম্মতি ব্যতীত প্রতিনিধিকে অপসারণ করা যাবে না বা মালিকের হলেও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই উঠে যাবে না বা প্রতিনিধি একবার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বের দ্বায়িত্ব গ্রহণ করলে তা পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারবে না।[২১]

সিওরিটি বা গ্যারান্টি চুক্তি

আরবীতে কাফালাহ (كفالة) শব্দটি সিওরিটি চুক্তির জন্যে ব্যবহৃত হয়। কাফালাহ অর্থ- সংযোগ। ইসলামী আইনে কোন কিছুর জন্যে কারো পক্ষ হয়ে কোন দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করার নাম সিওরিটি চুক্তি। যে ব্যক্তি গ্যারান্টির দায়িত্ব গ্রহণ করে তাকে গ্যারান্টার (আল- কাফিল) বলা হয়। যে ব্যক্তি বা সম্পত্তির জন্যে গ্যারান্টি দেয়া হয় তাকে আরবীতে মাকফুল বিহি বলা হয়। ঋণ পরিশোধে অক্ষম যে ব্যক্তির জন্যে

গ্যারান্টি দেয়া হয় তাকে প্রধান ঋণী (মাকফুল আনহু) বলা হয়। যে ব্যক্তিকে এ গ্যারান্টি দেয়া হয় তাকে পাওনাদার বলা হয়।[২২]

গ্যারান্টি দু'প্রকারের – ১. ব্যক্তির জন্যে গ্যারান্টি ও
২. সম্পত্তির জন্যে গ্যারান্টি ।

সুতরাং ব্যক্তির উৎপাদন কাজের জন্যে, ঋণ বা আর্থিক বাধ্যবাধকতার জন্যে সম্পত্তি সরবরাহের ন্যায় বিষয়ের জন্যে গ্যারান্টি দেয়া হয়ে থাকে। এখানে আমরা শুধু সম্পত্তির সিওরিটি বা গ্যারান্টির কথাই আলোচনা করবো।

১৮৭২ সালে ইন্ডিয়ান কন্ট্রাক্ট আইনের ১২৬ অনুচ্ছেদে গ্যারান্টি চুক্তি সম্পর্কে বলা হয়ঃ তৃতীয় কোন ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের অক্ষমতায় তার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রতিজ্ঞাই গ্যারান্টি চুক্তি নামে অভিহিত।[২৩]

এটা সিওরিটি চুক্তির সাধারণ নিয়ম যে, প্রকৃত ঋণী বা প্রধান ঋণীকে তার দেনা পরিশোধের জন্যে দাবিদার বা পাওনাদার যে আহবান জানাবেন এতে তার স্বাভাবিক স্বাধীনতা থাকবে । দেনা পরিশোধ না হয়ে থাকলে ঋণীর প্রতি পাওনাদারের দাবি অন্যায় কিছু হবে না। যদি চুক্তি এমন হয়ে থাকে যে, ঋণ পরিশোধের দায়-দায়িত্ব থেকে প্রকৃত ঋণীকে অব্যাহতি দিয়ে দেয়া হবে তাহলে তা সিওরিটি চুক্তি না হয়ে হাওয়ালা (দায়িত্ব হস্তান্তর) হবে।

এটি ভবিষ্যত কোন ঘটনার সাধারণ শর্ত সাপেক্ষ বা আনুষঙ্গিক বিষয় হতে পারে। উভয় প্রকার সিওরিটিই ঋণদাতার নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়া শর্ত, কিন্তু প্রধান ঋণীর যে সম্পত্তির উপর দাবি রয়েছে, তার উপরই সিওরিটি প্রয়োজন। সুতরাং শাস্তি বা প্রতিশোধের বেলায় তা প্রযোজ্য নয়। অপর পক্ষে শুধু অর্থঋণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় বরং কিমি (যে সকল সাধারণ দ্রব্য সাধারণত ওজন বা পরিমাপের মাধ্যমে বিক্রি হয় না) জাতীয় দ্রব্যের[২৪] বেলায় প্রযোজ্য।

সিওরিটির দায়িত্ব সম্পাদন

সিওরিটির দায়িত্ব সম্পাদন নিম্নোক্তভাবে করা যেতে পারে।[২৫]

১. মূল চুক্তির সাথে পার্থক্যের মাধ্যমে

সিওরিটির সম্মতি ব্যতিরেকে দাতা ও প্রধান গ্রহীতা চুক্তিতে কোন পরিবর্তন সাধন করলে পুরাতন চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। সাথে সাথে এ জাতীয় পরিবর্তন

সাধনের ফলে সংগঠিত লেনদেন জাতীয় সিওরিটির দায়-দায়িত্বও বাতিল বলে পরিগণিত হয়। যেমন কোন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য A বাৎসরিক বেতনের ভিত্তিতে B-কে ক্লার্ক নিযুক্ত করলো এ শর্তে যে, B -কে ক্লার্ক হিসেবে অর্থের বিনিময়ে তার দায়িত্ব পালন করছে কিনা তা দেখার জন্যে A C এর সিওরিটি হলো; কিন্তু পরে যদি দেখা যায় যে, A -কে জ্ঞাত করানো ব্যতিরেকে বা তার সম্মতি ব্যতীত B ও C রাজী হলো যে, জিনিসপত্র বিক্রির হার অনুসারে নির্ধারিত বেতনের পরিবর্তে B-কে কমিশন দেয়া হবে। এ ক্ষেত্রে পরে B-এর অসদাচরণের জন্যে A দায়ী থাকবে না।

২. মূল গ্রহীতাকে অপসারণ বা অব্যাহতি দানের মাধ্যমে

মূল গ্রহীতার বাধ্যবাধকতা অপসারিত হলে সিওরিটির বাধ্যবাধকতাও অপসারিত হয়ে যায়। মূল গ্রহীতার বাধ্যবাধকতা তখনই অপসারিত হবে যখন নতুনভাবে চুক্তি করা হয় বা দাতা চুক্তি বাতিল করে বা অন্য কিছু করার জন্যে পুরাতন চুক্তির মেয়াদ হ্রাস করে, যার বৈধ পরিণাম মূল গ্রহীতার অপসারণ। যেমন–

ক. C-এর পক্ষে A এই বলে গ্যারান্টি দেয় যে, B -কে দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হবে, C চুক্তি অনুসারে B -কে দ্রব্যাদি সরবরাহ করলে B হতবাক হলো এবং তাদের সাথে (C সহ) চুক্তি অনুসারে দাবি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে তার সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিল। এর ফলে C -এর সাথে চুক্তি অনুসারে B ঋণ থেকে মুক্তি পেল এবং A সিওরিটির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেল।

খ. B প্রয়োজনীয় কাঠ সরবরাহ করবে এবং নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে B -এর জন্যে বাড়ি বানানো হবে এ শর্তে A-এর সাথে B-এর চুক্তি হলো। A -এর কর্ম সম্পাদন সম্পর্কে C গ্যারান্টি প্রদান করলো। B কাঠ সরবরাহ করতে অস্বীকার করলে C -কে সিওরিটির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো।

৩. আংশিক অর্থের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধের চুক্তির অঙ্গীকার

দাতা ও মূল গ্রহীতার মধ্যে এমন চুক্তি হয় যাতে দাতা আংশিক অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধের নিমিত্তে সময় দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে

থাকে বা মূল গ্রহীতাকে অভিযুক্ত করা হয় না; এ সব চুক্তিতে সিওরিটি সমেত না হলে সিওরিটিকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

সম্পত্তির জন্যে যে সিওরিটি নিযুক্ত হয় তার মৃত্যু ঘটলে চুক্তি বাতিল হয়ে যায় না, কেননা সম্পত্তির সিওরিটির মৃত্যুর সাথে সাথে সিওরিটির বাধ্যবাধকতা শেষ হয়ে যায় না, যেহেতু তার যে কোন পরিমাণ সম্পত্তির মাধ্যমে তা পালন করা দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে সম্পত্তি উদ্ধারের মাধ্যমে সিওরিটির অব্যাহতি ঘটে।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা আমাদের নিকট সুস্পষ্ট যে, ইসলামের বিধি-বিধান ও আইন পদ্ধতি মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিধায় তা মানব রচিত আইনের ফাঁক এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত। ইসলামের চুক্তি আইনে নেই কোন ছলচাতুরি বা ধোঁকা-প্রতারণা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানবগোষ্ঠীর জন্য এ আইন কল্যাণকর। তাই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি সাধনে ইসলামের চুক্তি আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

তথ্যনির্দেশ

১. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (আল কুরআন, ৫:১)

২. A contract is an agreement enforceable at law made between two or more persons, by which rights are required by one or more by to acts of forbearances on the part of the other or others. বিস্তারিত দ্র. জামিল, সৈয়দ হাসান, *চুক্তি আইন,* ঢাকা : হীরা ল' বুক সেন্টার, ২০০৭, পৃ. ৯

৩. হোসাইন, এ, বি, এম. অনু: এম রুহুল আমিন, *ইসলামের বাণিজ্য আইন,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ২০০০, পৃ. ১

৪. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ

مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (আল-কুরআন, ২:২৮২)

৫. শফী, মুফতী মুহাম্মদ, *তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন,* অনু: ও সম্পা:; মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *কোরআনুল করীম বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর,* মদীনা মুনাওয়ারাঃ খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি. পৃ. ১৫৮

৬. আল-মারগিনানী, বুরহান উদ্দীন, *আল হিদায়া,* দিল্লীঃ আশরাফী বুক ডিপো, ১৩২৪ হি. খ.৩, পৃ. ২-৩

৭. Musleh Uddin, Dr. Muhammad. *Insurance and Islamic law,* Lahore: Islamic Publication Ltd. 1969, P. 108

৮. প্রাগুক্ত

৯. হোসাইন, এ, বি, এম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

১০. এখানে বায়' সালাম অর্থ-অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। আগামীতে কোন এক সময় সরবরাহের শর্তে এবং তাৎক্ষণিক সম্মত মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে নির্দিষ্ট পরিমাণ শরীআহ অনুমোদিত পণ্য-সামগ্রী অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়কে 'বায় সালাম' বলে। (দ্র. মোঃ আবু তাহের, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ব্যাংকিং,* ঢাকাঃ চলক প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ৩০৫)

১১. ইস্তিসনা হল কার্যাদেশের ভিত্তিতে পণ্যক্রয় চুক্তি। অর্থাৎ– ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোন সময়ে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে সম্মতমূল্য পরিশোধের শর্তে ক্রেতার ফরমায়েশ অনুযায়ী শরীআহ অনুমোদিত নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যসামগ্রী তৈরী করে বিক্রয় করাকে 'ইস্তিসনা' বলা হয়। (দ্র. মোঃ আবু তাহের, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬)

১২. হোসাইন, এ, বি, এম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১

১৩. Chachat, *An Introduction to Islamic Law*, London: Oxford University Press, 1964, p. 152

১৪. হোসাইন, এ, বি, এম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২

১৫. আল-মারগিনানী, বুরহান উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

১৬. হোসাইন, এ, বি, এম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

১৭. Musleh Uddin, Dr. Muhammad. Op.cit, p. 322

১৮. হোসাইন, এ. বি. এম. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

১৯. Chachat, *An Introduction to Islamic Law*, Op.cit, P. 122

২০. হোসাইন, এ. বি. এম. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩

২১. Rahim, Abdur *Muhammadan, Jurisprudence*, Lahore: Islamic Publication Ltd. (n.d), P. 322

২২. হোসাইন, এ. বি. এম. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

২৩. প্রাগুক্ত

২৪. Chachat, *An Introduction to Islamic Law*, Op.cit, pp. 158-159

২৫. হোসাইন, এ. বি. এম. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ ৭, সংখ্যা ২৫
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১১

মোগল আমলে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা (১৫২৬-১৭০৭)

ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান*

[সারসংক্ষেপ : ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ষোড়শ শতাব্দীতে। ১৫২৬ সনের ২১ এপ্রিল পানিপথের প্রথম যুদ্ধে তুর্কী বীর জহিরউদ্দিন মুহম্মদ বাবরের কাছে লোদি বংশের সুলতান ইব্রাহীমের শোচনীয় পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ভারতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুত পানিপথের বিজয় মোগলদের জন্য বিশাল ভারত শাসনের নতুন দ্বার খুলে দিয়েছিল। সম্রাট বাবর যদিও এই সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন কিন্তু এর বিশাল আয়তন, দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্য সুদৃঢ় ভিত্তি এবং সুবিস্তৃত প্রশাসনিক অবকাঠামো নির্মাণ করেন মূলত সম্রাট আকবর। তবে ভারতীয় রাজা-বাদশাহদের মধ্যে মোগল সাম্রাজ্যকে সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃতি দিয়েছিলেন আকবরেরই উত্তরসূরী সম্রাট আওরঙ্গজেব। বাংলায় মোগল আমলের সূত্রপাত ঘটে সম্রাট আকবরের আমলে। তাঁর সুযোগ্য সেনাপতি মুনিম খানের হাতে তুকারয়ের যুদ্ধে (৩ মার্চ ১৫৭৫) আফগান শাসক দাউদ খান কাররানির পতনের ফলে বাংলা মোগলদের অধিকারে আসে। পরবর্তীকালে মোগলদের এই বাংলা বিজয় পর্বের সমাপ্তি ঘটেছিল ১৬৬৬ সনে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে শায়েস্তা খাঁ কর্তৃক চট্টগ্রাম দখলের মাধ্যমে। নিম্নে সম্রাট বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গির, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব এর ভূমিরাজস্বনীতি ও ব্যবস্থা, ভূমিরাজস্বের হার, ভূমিরাজস্ব প্রদানের মাধ্যম উপস্থাপন করা হয়েছে।]

সম্রাট বাবর (১৫২৬-১৫৩০)

নতুন সাম্রাজ্যের সূচনা এবং চরম প্রতিকূলতার মাঝে সম্রাট বাবর ক্ষমতা গ্রহণের পর ১৫২৬ সন থেকে ১৫৩০ সন-এই সময়কালের মধ্যে তাকে ছোট-বড় বেশ কয়েকটি যুদ্ধ করতে হয়েছিল। নিজ সৈন্যদের বিদ্রোহ ও অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যস্ততার কারণে তাঁর পক্ষে উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকর বা রাজস্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, তিনি তাঁর শাসন কর্তৃত্ব দৃঢ়করণের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। ড. রাধে শ্যাম বলেন, 'While fighting the Afgans

---

*প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বাড্ডা আলাতুন্নেছা স্কুল এন্ড কলেজ, বাড্ডা, ঢাকা

and the Rajputs Babar was not oblivious of the necessity of consolidating his possessions and position. The process went on simultaneously. As a ruler it was incumbent upon him to define the biundaries of his empire and to give it a copact shape.[১]

সম্রাট বাবর তাঁর স্বল্পকালীন শাসনামলে ভূমিকর ধার্য ও আদায়ের ব্যাপারে মোটামুটি তিন ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন–

১. প্রাথমিক যুগের দিল্লির সুলতানদের মত তিনি 'খালিশা' বহির্ভূত অঞ্চলে প্রচলিত 'ইকতা' ব্যবস্থা চালু রাখেন।[২] সেলজুক শাসকদের অনুসরণে তিনি এর নতুন নামকরণ করেন 'তিয়ুল'।[৩] যে সমস্ত তুর্কি, মোগল ও আফগান আমীর-ওমরা তথা উচ্চপদস্থ শাসন কর্মকর্তা বাবরের অধীনে কাজ করতেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহে সঙ্গী ছিলেন–অথচ এদেরকে অন্যান্য রাজকর্মচারীদের ন্যায় নিয়মিত বেতন-ভাতা দেয়া সম্ভব ছিল না[৪] এমন ব্যক্তিদের 'খালিশা' বহির্ভূত অঞ্চলে রাজস্ব-স্বত্বনিয়োগ দেয়া হতো। এই রাজস্ব-স্বত্বনিয়োগীদের 'ওয়াজদার'ও বলা হতো। ওয়াজদার দু' ধরনের ছিল– ক. 'ওয়াজ-ইস্তকামাত' বা স্থায়ী প্রকৃতির এবং খ. 'ওয়াজ উলুফা' বা অস্থায়ী রাজস্ব-স্বত্বনিয়োগ। এরা সকলেই সম্রাটের ইচ্ছা-অনিচ্ছার আজ্ঞাধীন ছিলেন। অর্থাৎ এরা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট 'ওয়াজ' বা 'তিয়ুলে' অবস্থান করতে পারতেন। তিনি যখন তখন তাদেরকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বদলি বা তাদের অধি-ক্ষেত্রের সীমা কম বেশী করতে পারতেন। মূলত এটি ছিল সুলতানি আমলের 'ইকতা'রই নামান্তর বা মোগল সংস্করণ। কারণ আমরা দেখতে পাই, "the Wajhdars of Babar's time performed all the functions of the Iqtadars of the earlier period.[৫]

২. রাজস্ব-স্বত্বনিয়োগে বাবর যেমন সরাসরি স্বীয় পছন্দের ব্যক্তিদের নিয়োগ দিতেন অথবা প্রয়োজনে 'ওয়াজদার'কে সুবিধা মতো এক জায়গা থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিতেন এবং অন্যদেরকে তদস্থলে পদায়ন করতেন, কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি বোধগম্য কারণেই বিভিন্ন বিজিত অঞ্চলে স্থানীয় সামন্ত প্রধান বা অঞ্চলাধিকারীদের তার নিজস্ব স্থানে বহাল রেখে রাজস্ব-স্বত্বনিয়োগ দান অব্যাহত রাখেন। তবে সেক্ষেত্রে এসব সামন্ত প্রভুদেরকে অবশ্যই সম্রাটের পূর্ণ আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করতে হতো এবং প্রায়োগিক স্বীকৃতি স্বরূপ সম্রাটকে অধিকৃত অঞ্চলের ভূমিরাজস্ব বাবদ বার্ষিক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অংকের নগদ অর্থ ও উপঢৌকন প্রদান করতে হতো। অধিকন্তু সম্রাটের প্রয়োজনে তারা সৈন্য বা লোকবল সরবরাহ করেও তাঁকে সাহায্য করতো।[৬] উল্লেখ্য যে তখন পর্যন্ত

মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি খুব মজবুত ছিল না; অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রু সর্বদাই ক্ষমতা হরণে ওঁৎ পেতে থাকত। এছাড়া নতুন নতুন বিজিত অঞ্চলের অচেনা পরিবেশে শাসনকর্তা নিয়োগের মতো উপযুক্ত লোকেরও যথেষ্ট অভাব ছিল–এমতাবস্থায় ঐ এলাকায় আগে থেকেই যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল (সচরাচর 'জমিদার' নামেই এরা পরিচিত ছিল) তাদেরকেই সম্রাট স্ব-পদে বহাল রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করেন। এই জমিদাররা যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় এগুলোর ভূমিরাজস্ব ভোগ করত ও কেন্দ্রীয় মুসলিম সুলতানদের মৌখিক ও প্রায়োগিক আনুগত্য স্বীকার করে প্রায় স্বাধীন রাজার মতো চলতো। তাই বলা যায়, সম্রাট বাবর এদের কাছ থেকে নগদ আর্থিক ও সামরিক সুবিধা আদায় করে তাদের চিরাচরিত জীবনপ্রবাহ অব্যাহত রাখতে সুযোগ দেন।[৭]

৩. 'খালিশা'র অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ ও এলাকাগুলোতে সুলতানী শাসন আমলের নিয়মিত প্রশাসনিক অবকাঠামো ও তার ভিত্তিতে পরিচালিত ভূমিরাজস্ব প্রথা পদ্ধতি সম্রাট অব্যাহত রাখেন। এ বিষয়ে যতদূর জানা যায়, তিনি গোটা সাম্রাজ্যকে ২০ টি সরকারে বিভক্ত করেন।[৮] প্রতিটি জেলার জন্য একজন 'হাকিম' ও একজন 'দিওয়ান' এবং তাদের অধীনে অসংখ্য কর্মচারী ছিল। 'হাকিম' ছিলেন সাধারণ প্রশাসন ও বিচার বিভাগের মুখ্য অধিকর্তা, অন্যদিকে 'দিওয়ান' ছিলেন ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত কায়কারবারের নিয়ন্তা। সকলেই বাবরের প্রত্যক্ষ অনুমোদনে নিযুক্তি লাভ করতেন। প্রতিটি জেলা আবার কয়েকটি 'পরগনা'য় এবং 'পরগনা' অনেকগুলো গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত হতো। সাধারণত 'পরগনা'র প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন 'শিকদার'।[৯] 'পরগনা'র ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় যাবতীয় দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতেন 'আমিল' নামক কর্মচারী। তার সহযোগী হিসাবে ছিলেন 'কানুনগো' (ভূমিরাজস্ব নিরূপণকারী), 'আমিন' (রাজস্ব আরোপযোগ্য ভূমির পরিমাপক) প্রভৃতি নিম্নপদস্থ কিন্তু ভূমিরাজস্ব বিভাগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী। এরা মূলত 'দিওয়ানে'র দপ্তর থেকে বেতন ভাতাদি পেতেন।

তাঁর সময়ে ভূমিকর বা রাজস্বের হার কত ছিল এটা নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও ধারণা করা যায় তা লোদি সুলতানদের সময়কার মতই ছিল। উল্লেখ্য যে, সম্রাট রাজকোষের সাময়িক ঘাটতি মোকাবিলার জন্য 'ওয়াজদার'দের ওপর এককালীন ৩০% ভাগ করারোপ করেছিলেন বলে ড. মহিব্বুল হাসান জানিয়েছেন।[১০]

সম্রাট হুমায়ুন (১৫৩০-১৫৪০)

সম্রাট হুমায়ুন তাঁর এক দশকের শাসনকালে ভূমিরাজস্ব নীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্যের অনুসরণ ছাড়া আর কিছু করতে পেরেছিলেন বলে জানা যায় না। কারণ একদিকে সমকালীন রাজনীতির চাহিদা মিটিয়ে তথা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থেকে এবং অন্য দিকে অপেক্ষাকৃত উন্নত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী, সমরকুশলী ও সুযোগ্য আফগান শাসক শেরশাহের কাছে অসময়ে সিংহাসন হারিয়ে (১৫৪০) ও পরবর্তী প্রায় ৫ বছর দুর্ভাগ্যপীড়িত যাযাবরের মতো একস্থান থেকে অন্য স্থানে পালিয়ে বেড়িয়ে চেষ্টা নৈপুণ্যে যখন দ্বিতীয়বার তিনি সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন (২৩ জুলাই, ১৫৫৫) তখন অনিবার্য মৃত্যু (১৫৫৬) তাঁকে সেই হৃত সাম্রাজ্য সুসংহত ও পুনর্গঠিত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। অবস্থাদৃষ্টে বলা যায়, শাসক হুমায়ুনের অমোঘ নিয়তিই তাঁর শাসন ব্যবস্থায় পরিকল্পিত ও কার্যকর ভূমিরাজস্ব নীতি গড়ে তোলার পথে কঠিন অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি পিতা বাবরের চেয়েও দু'বারে মিলিয়ে অধিককাল রাজ্য শাসনের সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু শেরশাহের মতো প্রবল শক্তিশালী প্রতিপক্ষ তাঁর সব স্বপ্ন সাধ ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। দ্বিতীয়বার শাসন করাকালে যে সাম্রাজ্য তিনি ফিরে পেয়েছিলেন তার প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ও ভূমিরাজস্ব নীতিতে শেরশাহের প্রভাব ও সৌকর্য এত বেশী ছিল যে, সেটিকেই হুমায়ুন অবলীলাক্রমে গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত Moreland-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করা যায়। তিনি সমসাময়িককালের লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, "There is nothing in the literature to indicate that either Babur or Humayun made any alterations in the agrarian system of northern India, and the few references I have traced to the subject suggest that they accepted what they found."[১১]

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, তিনি পিতা বাবরের আমলে প্রদত্ত রাজস্ব-স্বত্বনিয়োগসমূহ বহাল রেখেছিলেন,অধিকন্তু নববিজিত অঞ্চল যেমন বাংলা ও অন্যত্র এই ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটান।[১২] তাঁর শাসনামলে শস্য ভাগাভাগি প্রথাও প্রচলিত ছিল।[১৩]

সম্রাট বাবর ও হুমায়ুনের সময় নতুন কোন জরিপ ছাড়াই যে সুলতানি শাসন আমলের বিভিন্ন দলিল- দস্তাবেজের ভিত্তিতে ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায় করা হতো, সে বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ মোটামুটি নিঃসন্দেহ।[১৪]

সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)

সম্রাট আকবর ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি সিংহাসনে আরোহণ করলেও বিপুল প্রভাবশালী বৈরাম খানের ক্ষমতার দাপটে স্বীয় ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। ১৫৬২ সন হতে তিনি যথাযথভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ পান। ক্ষমতায় আরোহণের পর হতে পরবর্তী চার দশকেরও বেশী সময়ব্যাপী সমন্বিত ও যুগোপযোগী ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সম্রাট যে সকল রীতি-নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন, তাকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। এর প্রথমভাগকে সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে তাঁর সিংহাসনে আরোহণের বছর থেকে নিয়ে পরবর্তী প্রায় ২৪ বছর অর্থাৎ ১৫৫৬-৮০ খ্রি. পর্যন্ত। এ পর্বে প্রচলিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার যুগোপযোগী সংস্কারে ও একটি নির্ভরযোগ্য কল্যাণধর্মী প্রশাসনিক অবকাঠামো নির্মাণে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, Moreland-এর ভাষায় 'series of experiment'[15] করেছিলেন। দ্বিতীয়ভাগের স্থায়িত্ব-কাল ছিল ১৫৮০ সন থেকে ১৬০৫ সন-মৃত্যু অবধি। এ সময়ে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় সুসংহত ও স্থায়ীরূপের বিকাশ-'stability of system had been attained'[১৬] বলে Moreland সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

১৫৬৩ সনে সম্রাট আকবর প্রথম তাঁর স্ব-প্রণোদিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। এজন্যে 'খালিশা'র অন্তর্ভুক্ত ভূমিকেই বেছে নেন তিনি। মোগল শাসনামলে রাষ্ট্রের সমুদয় ভূমিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হতো। এক. 'খালিশা' বা খাসমহাল, দুই. জায়গির বা ভূমিরাজস্ব-স্বত্ব নিয়োগ এবং তিন. জমিদারী বা স্থানীয় সামন্ত-প্রভু ও রাজন্যপ্রশাসিত অঞ্চল। ড. সুলেখ চন্দ্র গুপ্ত অবশ্য এই তিনটিকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করেছেন-'খালিশা' ও জায়গির।[১৭] আগ্রা, দিল্লী ও লাহোর (অংশ বিশেষ)-এই তিনটি প্রদেশের 'খালিশা'র অন্তর্ভুক্ত ভূমি থেকে যে রাজস্ব আয় হতো তার পরিমাণ ছিল প্রায় ২$\frac{১}{২}$ লাখের মতো।[১৮]

১৫৮০ সনে সম্রাট তাঁর সুদীর্ঘ শাসনামলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী রাজস্ব-সংস্কার প্রবর্তন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রথম সংস্কার হল দৈনন্দিন সাধারণ প্রশাসন থেকে ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের পৃথকীকরণ। এ লক্ষ্যে তিনি প্রশাসনকে নতুনভাবে ঢেলে সাজান। দ্বিতীয়ত 'দশসালা'[১৯] বন্দোবস্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে নতুনভাবে রাজস্ব জমা নির্ধারণ করেন। 'আইন-ই-আকবরী'র ভাষায় বলা যায়, 'From the beginning of the 15[th] year of the divine era of the 24[th] an aggregate of the rates of collection was formed and a tenth of the total was fixed as the

annual assessment; but form the 20th to the 24th year the collections were accurately determined and the five former ones accepted on the authority of persons of probity.[২০]

বস্তুত অধিকাংশ আধুনিক ঐতিহাসিকের বিবেচনায় 'দশসালা' বন্দোবস্ত শুধু সম্রাট আকবরের নয়, বরং ছিল সমগ্র মোগল শাসনামলের সবচেয়ে মৌলিক ও সুদূরপ্রসারী রাজস্ব সংস্কার। এ সম্পর্কে দু'জন প্রখ্যাত আধুনিক ঐতিহাসিকের মন্তব্য উদ্ধৃত করা হল। ড. ইসতিয়াক হুসেন কোরেশি বলেন, "This was the most basic and far reaching reform undertaken during the Mugal regime."[21] ড. জগদীশ নারায়ন সরকারও বলেন, "This was perhaps the most fundamental reform in the Mugal period and it had far-reaching significance."[২২]

সম্রাট হিসাবে আকবরের সমগ্র জীবনকাল বিশ্লেষণ করলে একটি জিনিস স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, তা হলো সকল ধর্মের মানুষের প্রতি তাঁর অভূতপূর্ব সমতা নীতি। মূলত আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্রের যে মূল ধারণা তাই ছিল তাঁর চিন্তা চেতনা। যদিও সর্বদা ধর্মীয় নিরপেক্ষতা নীতি অনুসরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।[২৩]

একটি যুগোপযোগী ও সর্বজনগ্রাহ্য ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা অবলম্বন করতে যেয়ে সম্রাট আকবর অপেক্ষাকৃত উদার ও সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। একদিকে তিনি হিন্দু প্রজাদের কাছ থেকে 'জিযিয়া' কর আদায় রহিত করেছিলেন, অন্যদিকে মুসলমানদের দেয় বাধ্যতামূলক ধর্মীয় কর 'যাকাত' আদায়ও বন্ধ করেছিলেন।[২৪] এর ফলে কেন্দ্রীয় রাজকোষের যে ক্ষতি হয়েছিল তা সম্রাট 'পরিবর্ত কর ব্যবস্থা' চালু করে পুষিয়ে নিয়েছিলেন। এর মধ্যে ছিল 'জরিবানা' (ভূমি জরিপকালে মাঠ আমিনদেরকে দেয় 'ফী'), 'মুসাল্লিনা' (রাজস্ব আদায়কারীদের 'ফি'),[২৫] লবণ কর প্রভৃতি। এ ছাড়া রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্যেও জড়িয়ে পড়েছিল।[২৬] মোটকথা, আকবর তাঁর ভূমি রাজস্ব নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণে ইসলামী অনুশাসনকে প্রাধান্য দেননি।

সম্রাট আকবর যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন মোগল সাম্রাজ্যব্যাপী তখন ভূমিরাজস্ব নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং তার স্বেচ্ছাচারী প্রয়োগ শুরু হয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন বিচ্ছিন্ন পদ্ধতিগুলোকে একটি বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ার ভেতর শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে। যদিও কাজটি ছিল সম্রাটের জন্য বেশ কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ।[২৭]

সম্রাট জাহাঙ্গির (১৬০৫-১৬২৭)

সম্রাট জাহাঙ্গির স্বীয় পিতা সম্রাট আকবরেরই অনুসৃত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা (সামান্য কিছু পরিবর্তন ছাড়া) আগাগোড়া বহাল রেখেছিলেন।[২৮] ড. ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "His (Jahangir) father had bequeathed to him a legacy of noble ideals and however rebellious and refractory he may have been in his youth, he now cherished a lofty ideal of kingship and regarded the contentment and prosperity of his subjects as his primary concern."[২৯]

সম্রাট জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে ভূমিরাজস্ব নির্ধারক হিসেবে যে কয়টি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, জবতি'[৩০] 'নাসক'[৩১] গল্লাবকশি[৩২] প্রভৃতি।

সম্রাট জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে ভূমিরাজস্ব নির্ধারক হিসেবে 'জবতি' 'নাসক' গল্লাবকশি প্রভৃতি পদ্ধতি বর্তমান ছিল। সে সময় রাজস্ব আদায় করা হতো মূলত জায়গিরদার ও জমিদারদের মাধ্যমে। জায়গিরদারগণ ছিলেন অনেকটা সরকারি কর্মচারীদের মতো। তাদের বদলির চাকরী হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তাদের নিয়ন্ত্রণে যে জায়গা জমি থাকতো তার প্রতি তারা থাকতেন উদাসীন। সরকারের আর্থিক সুবিধা ও চাপ থাকা সত্ত্বেও তারা জায়গা-জমির উন্নতির মাধ্যমে রায়তদের কাছ থেকে রাজস্ব বৃদ্ধির পরিবর্তে ব্যক্তি স্বার্থে নানা অজুহাতে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করতেন। এতে করে যে শর্তে মূলত জায়গিরদারকে জায়গির প্রদান করা হতো, তা ক্রমাগত শুধু লঙ্ঘিতই হতো না, তাদের অত্যাচার-নিপীড়নের মাত্রাও দিন দিন বেড়ে চলেছিল। অপরদিকে জায়গিরদারগণ একই স্থানে দীর্ঘদিন থাকত বলে স্থানীয় লোকদের সাথে তাদের সখ্যতা বেশী হতো। অনেক ক্ষেত্রে তাদের মেয়েদের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতো। এভাবেই তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক শক্তি অনেক বেড়ে যেত, যা সম্রাটের মোটেই কাম্য ছিল না। এ পরিস্থিতিতে সরকার জায়গিরদার, জমিদার প্রমুখ রাজস্ব কর্মচারীদের জন্য যে ১২টি আচরণবিধি (সচরাচর 'দস্তুর-উল-আমাল' বা Rules of Conduct হিসাবে পরিচিত) প্রণয়ন ও জারি করে ছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আলোচনা করা হলো–

১. তিনি বেশ কয়েক ধরনের আমদানি-রপ্তানি শুল্ক ও হয়রানিমূলক ট্রানজিট কর এবং সেই সাথে জায়গিরদার ও জমিদারদের দ্বারা স্থানীয়ভাবে গৃহিত নিপীড়নধর্মী টোল আদায় নিষিদ্ধ করেন;

২. সম্রাট সম্ভাব্য সকল উপায়ে জায়গিরদারদের নির্জন পথিপার্শ্বে জনবসতি গড়ে তোলার জন্য সরাইখানা, মসজিদ, কূপ প্রভৃতি তৈরী করার আদেশ দেন;
৩. মৃত ব্যক্তির ভূ-সম্পত্তি রাষ্ট্র কর্তৃক অধিগ্রহণের প্রচলিত নিয়ম তিনি বাতিল করেন এবং সেগুলো মৃতের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রত্যর্পণের আদেশ দেন;
৪. জমিদার ও জায়গিরদারদের অন্যায়ভাবে রায়তদের ভূ-সম্পদ গ্রাস এবং বিশেষ করে আবাসগৃহ থেকে তাদেরকে উৎখাত না করার নির্দেশ দেন;
৫. ভূমিরাজস্ব সংগ্রাহক ও জায়গিরদারদেরকে তারা যে 'পরগণায়' কর্মরত থাকবে সেখানে তাঁর (সম্রাটের) পূর্ব অনুমতি ব্যতীত স্থানীয় রমণীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না এবং
৬. সম্রাট সাধারণ ঘোষণা দেন যে, তার পিতার আমলে প্রদত্ত জায়গির, 'আইমা' প্রভৃতি যথারীতি বহাল থাকবে।[৩৩]

উল্লেখ্য ১২টি আচরণবিধি ছাড়াও জাহাঙ্গির আরও কিছু বিধিনির্দেশ জারি করেছিলেন।[৩৪]

সম্রাট জাহাঙ্গিরের আমলে কিছু সংখ্যক ফসলের বিশেষ করে ফলের বাগানসমূহকে রাজস্ব ধার্যের আওতামুক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল, তবে স্থানীয় রাজ কর্মচারীদের সদিচ্ছার অভাবে সেটা কতটুকু ফলপ্রসূ হয়েছিল তা বলা মুশকিল।[৩৫]

শেষ বয়সে সম্রাট জাহাঙ্গির রাজকার্যে অনেকটা উদাসীন হয়ে পড়ায় এবং পর্দার অন্তরালে তার বিদুষী স্ত্রীর প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রশাসনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো রাজস্ব ব্যবস্থাপনায়ও শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল।[৩৬]

সম্রাট শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮)

সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা আলোচনা ঐতিহাসিকদের জন্য একটি বিড়ম্বনায় বিষয়। সম্রাট জাহাঙ্গিরের আমলের ঐতিহাসিক রচনাদিতে রাজস্ব সম্পর্কীয় কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও সম্রাট শাহজাহানের সময়ে তাও দুর্লভ। মোরল্যান্ড বলেন, 'The contemporary chronicles tell us even less of the activities of Shahjahan than of Jahangir.''[৩৭] তাঁর সময়ে অনুসৃত রাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তাতে প্রতীয়মান হয় পূর্ববর্তী আইনই বহাল ছিলো। 'জবতি'র পরিবর্তে সম্রাট জাহাঙ্গির যে গ্রাম-ইজারা প্রথা ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করেছিলেন সেটা তিনিও অব্যাহত রাখেন।[৩৮] শুকনো মৌসুমে রায়তরা যাতে সহজে ভূমিতে সেচের পানি দিতে পারে সে জন্য সম্রাট বেশ কিছু খাল খনন করেন।[৩৯]

সম্রাট শাহজাহান জগদ্বিখ্যাত তাজমহল, দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, দিল্লীর বিখ্যাত জামে মসজিদ, মোতি মসজিদ, সাম্মান বুরুজ প্রভৃতি অত্যন্ত ব্যয় বহুল ও সৌকর্যমণ্ডিত স্থাপত্য শিল্পসমূহ নির্মাণ করেছিলেন বিধায় ধারণা করা হয় যে, তাঁর আমলে ভূমিরাজস্বের হার পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারপরও বলা যায় যে, তাঁর সময়ে ভূমি রাজস্বের হার কখনও $\frac{১}{৩}$ থেকে $\frac{১}{২}$ এর উপরে যায়নি।[৪০] তিনি কয়েকটি অবৈধ সেস বাতিল করেছিলেন।[৪১] যদিও বরাবরের মতো অঘোষিত সব 'আবওয়াব' তাঁর পক্ষে বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য যে, তাঁর প্রধান দিওয়ান সাদুল্লাহ খান কর্তৃক আদায়কৃত নিম্নলিখিত 'আবওয়াব' তখনও চালু ছিল যা পরে সম্রাট আওরঙ্গজেব রহিত করেন।[৪২]

ক. উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় কর;

খ. সম্পত্তি বিক্রয় কর;

গ. দিওয়ানি বিভাগীয় কর্মচারীদের রুসুমী;

ঘ. ব্যবসায় ও বৃত্তির অনুমতি-পত্রের জন্য কর;

ঙ. নজর, চাঁদা ও শ্রম আদায়;

চ. হিন্দু তীর্থ কর প্রভৃতি।

পরিশেষে বলা যায়, সম্রাট শাহজাহানের যুগে যদিও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়নি , উপরন্তু বিভিন্ন উচ্চাভিলাসী স্থাপত্য প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সম্রাটের বিপুল অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন ছিল যার প্রধান উৎস সেই ভূমি রাজস্ব, তথাপি তাঁর আমলে জনসাধারণ সুখে-শান্তিতেই তাদের দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। মোরল্যান্ডের ভাষায়, "so far as the chronicles go, we might look on the reign as a period of agrarian tranquility."[৪৩]

সম্রাট আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭)

সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর ছিলেন একজন প্রজাহিতৈষী শাসক। তাঁর রাজস্ব ব্যবস্থার মূল কথা ছিল রায়তদেরকে কোনরূপ কষ্ট না দিয়ে তাদের সহনশীল ক্ষমতার মধ্যে রাজস্ব আদায় করা তার হার ও পরিমাণ যাই হোক না কেন। তিনি রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা যেন বাস্তবেই ক্ষেতে-মাঠে গিয়ে রায়তদের সঙ্গে কথা বলে তাদের পছন্দনীয় পন্থায় 'জরিপ' বা জবতি, 'গল্লাবকশি' 'কানকূট'[৪৪] ইত্যাদির ভিত্তিতে 'জমা' নিরূপণ ও প্রদেয় কিস্তির (সর্বোচ্চ ৩) পরিমাণ ঠিক করে এবং সে অনুযায়ী কোনরূপ ছাড় না দিয়ে যথাসময়ে কিস্তি ওয়ারি 'হাসিল' (ভূমিরাজস্ব উসূল বা আদায়) সম্পাদন করে। এ ব্যাপারে

প্রপিতামহ আকবর নয়, বরং মহান শেরশাহ-ই ছিলেন সম্রাটের আদর্শ। স্মর্তব্য যে, দিল্লির সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান সুলতানের নীতি ছিল ভূমিরাজস্ব ধার্যকালে কর্মচারীরা হবে সর্বোচ্চ নমনীয় ও যুক্তিবান, কিন্তু রাজস্ব আদায়কালে তারা হবে কঠোরতম।[৪৫]

সম্রাট আওরঙ্গজেবের ভূমি রাজস্ব নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ইসলামী অনুশাসন নির্ভর। তিনি একজন প্রকৃত মুসলমান হিসাবে সর্বদাই কামনা করতেন প্রশাসনের সর্বস্তরে ইসলামী নীতি-আদর্শের প্রতিফলন ঘটুক। সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি বেশ কিছু অবৈধ আবওয়াব[৪৬] বাতিল করেছিলেন। তিনি ২ এপ্রিল ১৬৭৯ খ্রিষ্টাব্দে তদানিন্তন মোগল সাম্রাজ্যব্যাপী অ-মুসলিমদের উপর মুসলিম রাষ্ট্রের নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ 'জিযিয়া' কর পুনঃপ্রবর্তন করেন।[৪৭] ড.ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন,

> "The jeziya was levied with great rigour and a large staff of officers employed to collect it. ...Women, Children below 14 years of age and paupers who were destitute were exempt; blind men, cripples and lunatics paid only when they possessed wealth and religious men like heads of monastic establishments paid when they had wealth."[৪৮]

সম্রাটের 'জিজিয়া' কর পুনঃ চালুকরণের কারণ হচ্ছে, ব্যক্তিগত ধর্মপ্রীতি ও ইসলামী অনুশাসন প্রবর্তনের অন্তর্গত চাহিদা এবং অধিক যুদ্ধ বিগ্রহ বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে অপ্রত্যাশিত ব্যয় মেটানোর প্রচেষ্টা।[৪৯]

'জিজিয়া' কর আদায়ে তিনি হিন্দুদেরকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন–ধনী, মধ্য ও গরীব।[৫০] গরীবের জন্য মাথা পিছু বাৎসরিক রাজস্ব হার ছিল ১২ দিরহাম, মধ্যশ্রেণীর জন্য ২৪ দিরহাম ও ধনীদের ৪৮ দিরহাম।[৫১] গরিবদের জন্য এটি প্রযুক্ত হতো তখন, যখন তাদের আয় জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সীমা অতিক্রম করতো।

উল্লেখ্য যে, 'জিজিয়া' কর সকল হিন্দু জনসাধারণের ওপর আরোপিত হয়নি। যে কোন বয়সী নারী, বালক, কপর্দকশূন্য তথা ভিখারী, যুদ্ধগমনে অক্ষম বৃদ্ধ, ন্যূনতম জীবিকাধারী দরিদ্র, স্থায়ীভাবে অসুস্থ তথা পঙ্গু প্রমুখ এর আওতামুক্ত ছিল। এক কথায় অবস্থাপন্ন ও সামর্থ্যবানেরাই অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ অংশই ছিল 'জিযিয়া' করের আওতাধীন। এর মধ্যেও আবার যারা সামরিক বিভাগের চাকুরিতে ও অন্যান্য রাজকার্যে নিয়োজিত ছিল তাদেরকে 'জিযিয়া' দিতে হতো না।[৫২]

আওরঙ্গজেব হিন্দুদের উপর থেকে প্রচলিত যে সব কর তুলে দিয়েছিলেন তার কয়েকটি হলো তীর্থ কর, চিতা-ভস্মের কর, গঙ্গা স্নানের কর, মন্দির থেকে প্রাপ্তি ইত্যাদি।[৫৩]

জিযিয়া কর গরীবরা ৪ ও মধ্যবিত্তরা ২ কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারতো। আর্থিক সামর্থ্য না থাকলে দ্রব্যের মাধ্যমে তা পরিশোধ করতে পারতো। যৌক্তিক কারণে কেউ কর আদায়ে ব্যর্থ হলে তা মাফ করে দেয়া হতো। তবে কেউ অবাধ্যতা প্রকাশ করলে তার কাছ থেকে বকেয়াসহ কর আদায় করা হতো।[৫৪]

এ পর্যায়ে আমরা সম্রাট বাবর থেকে শুরু করে সম্রাট আওরঙ্গজেব পর্যন্ত জ্যেষ্ঠ মোগলদের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার অপরিহার্য কিছু দিক আলোচনা করবো।

ভূমিরাজস্বের হার

মোগল আমলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হারে ভূমিরাজস্ব দাবি করা হতো এবং তদনুপাতে তা আদায় করা হতো। ভূমিরাজস্ব ধার্যের সময় দু'টি বিষয়কে বিবেচনায় আনা হতো। প্রথমত-রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন, দ্বিতীয়ত-রায়তদের আর্থিক অবস্থা বা ভূমিরাজস্ব প্রদানের সঙ্গতি-সামর্থ্য। বন্যা-খরা-দুর্ভিক্ষে কৃষকদের ক্ষয়ক্ষতির আনুপাতিক হারে ধার্য রাজস্ব যেমন কম নেয়া হতো বা একেবারেই নেয়া হতো না, তেমনি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কৃষককে 'তাকাবি' ঋণ প্রদান করেও তাকে নবোদ্যমে উঠে দাঁড়াতে সহযোগিতা করা হতো। জমির উর্বরতা শক্তির স্থানীয় মান তথা মাটির গুণাগুণ, জলবায়ুর প্রভাব, সেচের সুবিধা-অসুবিধা, শস্যোৎপাদনে কৃষকের বিনিয়োগ প্রভৃতি ও ভূমিরাজস্বের হার কম বেশী করায় যথেষ্ট ভূমিকা রাখতো।[৫৫] উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, সম্রাট আকবরের নির্দিষ্ট প্রথা যেমন 'ফসল ভাগ' পদ্ধতিতে কাশ্মির রাষ্ট্রের পাওনা বাবদ আদায় করা হতো উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক পরিমাণ[৫৬] কিন্তু আজমিরের মরুময় এলাকা হতে আদায় করা হতো একের সাত বা আট ভাগ।[৫৭] সম্রাট আকবরের সময়ে গড়পড়তা ভূমিরাজস্বের হার ছিল উৎপন্ন শস্যের একের তিন ভাগ। অপরদিকে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে ভূমিরাজস্বের হার ছিল উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক। মূলত এগুলো ছিল পরিস্থিতি বিবেচনায় রাষ্ট্রীয় পাওনায় ছাড় দেয়ার রীতি বা প্রক্রিয়া, কোন বিধিবদ্ধ সাধারণ আইন নয়।[৫৮]

সম্রাট হুমায়ুনের রাজত্বকাল পিতা বাবর অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক হলেও বস্তুত তার অপেক্ষাকৃত কম মেধাজাত প্রশাসনিক অভিজ্ঞান, অস্থিরমতি ও প্রচলিত ভূমিরাজস্ব

ব্যবস্থাপনার যুগোপযোগী সংস্কার সাধনে উদ্যোগের অভাবে ভূমিরাজস্বের হার নির্ধারণে গতানুগতিক হিসাবই বেছে নিয়েছিলেন।[৫৯]

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ভূমিরাজস্বের হার ছিল উৎপাদিত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ।[৬০] যদিও স্থান ও কাল বিশেষে এই হার যথেষ্ট ওঠানামা করত। ড. ইসতিয়াক হুসেন কোরেশী বলেছেন, "Akbar fixed a third of the gross produce as the state demand; but from the beginning the level was nit uniform in all parts of the empire."[61]

সম্রাট আকবরের এই হার সম্ভবত সম্রাট জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালেও অব্যাহত ছিল।[৬২] তবে পরবর্তীকালে সেটা তার রাজত্বের শেষ দিকে উত্তরত্তর বেড়ে চলেছিল এ ধারণা করা যায়। ড. জগদীশ নারায়ণ সরকার বলেন, "The rate grew modaretly higher under Jahangir"[63]

আনন্দবিলাসী ও স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ গ্রহণে অনুৎসাহী সম্রাট জাহাঙ্গিরের আমলে সুলতানদের আমলের গড়পড়তা ভূমিরাজস্ব হার প্রচলিত ছিল। সম্রাট শাহজাহানের সময়ে ভূমিরাজস্বের সাধারণ হার ছিল উৎপন্নের অর্ধেক। শাহজাহানের রাজত্বের শেষের দিকে দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত দিওয়ান মুর্শিদকুলি খান ফসল ভাগ পদ্ধতিতে জমি থেকে উৎপন্নের অর্ধেক, কুয়ো সেচের জমি থেকে এক তৃতীয়াংশ এবং উঁচু শ্রেণীর জমির উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর এক চতুর্থাংশ বা তারও কম রাজস্ব আদায় করতেন।[৬৪]

ভূমিরাজস্ব প্রদানের মাধ্যম

তৎকালীন ভূমিরাজস্ব মূলত দু'ভাবে দেয়া যেতো– এক. নগদ অর্থে (সাধারণ প্রচলিত মুদ্রায়) ও দুই. উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীতে। ভূমিরাজস্ব নগদ অর্থে গ্রহণে সম্রাট আকবরের নীতি ছিল খুবই স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। ব্যতিক্রম ব্যতীত অর্থাৎ যে সব ক্ষেত্রে বিকল্প ছিল না সেগুলো ছাড়া অন্য সকল পর্যায়ে তিনি রাজস্ব কর্মচারীদের নগদ অর্থে ভূমিরাজস্ব আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ড. ডি পান্থ বলেন, 'Akbar laid stress on the officials being paid in cash and dealing directly with the individual peasant cultivators'[৬৫]

সাধারণত নগদ আদায় প্রচলিত ছিল সেসব এলাকায় যেখানে 'জবতি' ও 'নসক' পদ্ধতিতে রাজস্ব ধার্য করা হতো।[৬৬] যেমন, আগ্রা, দিল্লি, আজমির, এলাহাবাদ, আউদ, লাহোর, বাংলা প্রভৃতি।

উপসংহার

মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম্রাট বাবরের ভূমিকা অতুলনীয়। সম্রাট আকবর এ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও সুসংহতকরণে বিশাল অবদান রাখলেও সম্রাট আওরঙ্গজেব সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃতির ক্ষেত্রে অবদান রেখে অমর হয়ে আছেন। অবশ্য ঐতিহাসিকদের মূল্যায়নে সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে সাম্রাজ্যের নজিরবিহীন প্রসার ঘটলেও অন্যদিকে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের বীজও রোপিত হয়েছিল মূলত এ সময়ে। মোগল সাম্রাজ্যের প্রত্যেক সম্রাট রাজ্যকে সুসংহত ও প্রজা সাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে যে অবদান রেখে গেছেন তা ইতিহাসে সোনালী অক্ষরে লেখা থাকবে।

তথ্যনির্দেশ

1. Shyam, Dr. Radhey *Babar, Patna* : Janaki Prakashan, 1978, p. 395.
2. Hasan Dr. Mohibul, *Babar : Founder of the Mughal Empire in India,* Delhi : Manohar : 1985, P.171
3. Loc.cit
4. কারণ এই রাজস্ব-স্বত্ব নিয়োগ উচ্চ পদস্থ আমির-উমরাদের কাছে বেতন-ভাতারও অতিরিক্ত বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের প্রতীক বলে বিবেচিত হতো। তাই সম্রাট তাঁর নানা সুখ-দুঃখের সাথীদের এগুলোর রাজস্ব-স্বত্বাধিকারী নিযুক্ত করে তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করেন।
5. Shyam, Dr, Radhey, *Babar,* Ibid, P.417
6. Hasan, Dr Mohibul, *Babur : Founder of the Mughal Empire in India,* Op.cit, P.172
7. ইসলাম, কাবেদুল, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা,* ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১, খ. ১, পৃ.১৭৯
8. Ibid, p.168.
9. Loc.cit
10. Ibid, p.158; Also see Dr, Radhey Shyam, *Babar,* Ibid, P.424.
11. Moreland, William Harrison, *The Agrarian System of Moslem India,* Op.cit, p.152
12. Loc.cit
13. Jaffar, Dr.S.M. *The Mughal Empire : form Babar to Aurangeb,* Op.cit. p.152
14. Srivastava, Dr.M.P. *Policies of the Great Mughals,* Chugh Publications, 1978, p.2

15. Moreland, William Harrison, *The Agrarian System of Moslem India*, Op.cit, P.80
16. Ibid
17. Gupta, Dr. Sulekh Chandra, *Agrarian Relations and Early British Rule in India,* Delhi : People's Publishing House, 1995, p.17
18. Srivastava, Dr. M.P, *Policies of the Gret Mughals,* Delhi : Chugh Pulications, 1978, p.5
19. ড. ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, 'The dashsala system ...It was levied on the average produce of the past ten years and the state demand in cash was fixed on the basis of the average of the last ten years. (Prasad, Dr. Ishwari, *A short history of Muslim Rule in India*. Delhi : The Indian Press (Pub) Pvt.Ltd, 1962, p.328-29)
20. Fazal, Abul, *The A'in-I Akbari,* Volume II., Translated by colonel H.S. Jarrett & Annotated by Sir Jadunath Sarkar, Delhi : Oriental Books Reprint Corporation, 1978, p.95
21. Qureshi, Dr. Ishtiaq Husain, *The Administration of the Sultanate of Dehli* ,Op.cit, p.168
22. Sarkar, Dr. Jagadish Narayan, *Mughal polity,* Delhi : Idarah-1 Adabiyat-1 Delhi, 1984, P.275
23. Burke, S. M, *Akber the Great Mogul,* Delhi : Munshiram Manoharlal, 1989, pp,258-59
24. Srivastava, Dr. M.P. *Policies of the Great Mughals,*Op.cit, pp.3-4
25. Sarkar, Dr. Jagadish Narayan *Mughal polity,* Op.cit, P.273
26. Srivastava, Dr. M.P. *Policies of the Great Mughals,* Op.cit, p..4
27. Sharma, Prof. Sri Ram, *The Crescent in India : A study in Medieval History* Bomby : Karnatak Publishing House, 1937, p.394
28. Srivastava, Dr.M.P. *Policies of the Great Mughals,* Op.cit, p.15
29. Prasad, Dr. Ishwari *A short history of Muslim Rule in India.* Op.cit, p.455
30. 'জবতি'- অভিধানে এর সঠিক অর্থ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। একে 'জরিপ' বা 'আমল-এ-জরিপ' এর সমার্থক হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে বলে এ যুগের কৃষি ও রাজস্ব ব্যবস্থার প্রধান বিশেষজ্ঞ ড. ইরফান হাবিব জানিয়েছেন। (ড. ইরফান হাবিব, *মুঘল আমলের কৃষি ব্যবস্থা,* প্রাগুক্ত, পৃ.২১২)
31. 'নাসক'-'নাসাক' শব্দের অর্থ প্রশাসন বা কোন প্রদেশ, জেলা ইত্যাদির দায়িত্ব পালন। ড. অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'Nasaq was a system which denoted summary assesment on the village or some larger area as a unit. Under nasaq there

was no need of assesment of land every year. Once it was assessed, its results could be repeated. (Dr. Anjali Chatterji, *Bengal in the Reign of Aurangzib,* {1658-1717}, Calcutta : Progressive Publishers, 1967, p.69)

32. 'গল্লাবকশি'–'গল্লাবকশি' ফারসি শব্দ, অর্থ 'ভাগচাষ' বা ফসলভাগ। (ড. আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম- শাসন,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯,পৃ.৩১২)
33. Mahajan, Dr.Vidyadhar.`*Mughal Rule in India*', Op.cit, p.136
34. Prasad, Dr. Ishwari, *The Mughal Empire,* Allahabad : Chugh Publications, 1974, P.412.
35. Sarkar, Dr. Jagadish Narayan, *Mughal Polity,* Op.cit, p.290
36. ইসলাম, কাবেদুল, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা,* প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.১৭৯
37. Moreland William Harrison, *The Agrarian System,* Op.cit, p.131
38. Srivastava, Dr.M.P. *Policies of the Great Mughals,* Op.cit, p.17
39. Ibid, p.16
40. Ibid, p.17
41. Sarkar, Dr. Jagadish Narayan, *Mugal Polity*, Op.cit, p.290
42. Prasad, Dr. Ishwari, *The Mughal Empire,* Op.cit, p.509
43. Ibid
44. 'কানকূট' দু'টি হিন্দি শব্দের যৌগ হচ্ছে 'কানকূট' বা 'দানাবন্দি' পদ্ধতি। আইন-ই-আকবরীতে বলা হয়েছে, `Kankut: Kan is the Hindi language signifies grain,and `Kut'estimate. The whole land is taken either by actual mensuration or by pacing it, and the standing crops estimated in the balance of inspection. The experienced in these matters say that this comes little short of the mark. If any doubt arise, the crops should be cut and estimated in three lots, the good, the middling and the inferior, and the hesitation removed.Often, too, the land taken by appraisement,gives a sufficiently accurate return. (Abul Fazal, *The Ani-I-Akbari*, Vol.I., Op.cit, p.47
45. ড. ইরফান হাবিব, *মধ্যকালীন ভারত,* খ. ১ ., (অনু, রাজা মুখার্জী), কলকাতা : কে. পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, ১৯৯০, পৃ.১৩৮
46. 'আবওয়াব'-'আবওয়াব' অর্থ খাজনার অতিরিক্ত কর (সেস)। সরকার ভূমির মূল খাজনা বৃদ্ধি করার পরিবর্তে নির্ধারিত খাজনার উপর নির্দিষ্ট হারে যে অতিরিক্ত সেস আদায় করার অনুমতি দিতেন তাকে আবওয়াব বলা হতো। অনেকে আবওয়াবকে বকশিশ, টিপস বা ঘুষ হিসেবে ভুল ব্যাখ্যা করেন। কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত অতিরিক্ত করই আবওয়াব। (মোঃ অবদুল কাদের, *ভূমি জরিপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা,* ঢাকা : এ. কে. প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ.১৫২-৫৩)

47. ড. জহিরুদ্দিন ফারুকী বিভিন্ন তথ্য-ঘটনা দ্বারা আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১৬৭৯ খ্রি. 'জিযিয়া' প্রবর্তিত হয়েছিল তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। (Dr.Ishwari Prasad, *The Mughal Empire,* Op.cit, P.596)
48. Prasad Dr.Ishwari, *The Mughal Empire,* Op.cit, p.597
49. দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সাথে আওরঙ্গজেব প্রায় ২৫ বছরের মতো ঘোরতর যুদ্ধ করেন।
50. Sarkar, Sir JaduNath, *A Short History of Aurangazib,* Op.cit, p.131
51. সরকার স্যার যাদুনাথ বলেন, The rates of taxation were fixed at 12, 24 and 48 dirhams, a year for the three classes respectively-or Rs 3.3/1, Rs 6.3/2 and Rs 13.3/1 (Sir Jadunath Sarkar, *A short history of Aurangzib,* Op.cit, p.131).
52. Faruki, Dr, Zahir Uddin, *Aurangzeb and his Times,* Allahabad : Kitab Mahal, 1977, p.153
53. Ibid, p.154.
54. Loc.cit.
55. ইসলাম, কাবেদুল, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা,* প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ.২২৮-২৯
56. হাবিব, ড. ইরফান, *মুঘল আমলের কৃষি ব্যবস্থা,* প্রাগুক্ত, পৃ.২০৫
57. প্রাগুক্ত
58. ইসলাম, কাবেদুল, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা,* প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.২২৮-২৯
59. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১
60. Moreland, William Harrison *The Agrarian System of Moslem India,* Op.cit, p.91
61. Qureshi, Dr. Ishtiaq Husain, *The Administration of the Sultanate of Dehli,* Op.cit, p.170
62. Srivastava, Dr.M.P. *Policies of the Great Mughals,* Op.cit, p.17
63. Sarkar, Dr. Jagadish Narayan Mugal Polity, Op.cit, p.293
64. ইরফান, ড. হাবিব, *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা,* (১৫৫৬-১৭০৭) রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কে.পি বাগচি, ১৯৯০, পৃ. ২০৭
65. Dr. D. Pant, *Commercial Policy of the Moguls,* Idarah-I adabiyat-I Delhi, 1978, P. 60
66. Sarkar, Dr. Jagadish Narayan *Mugal Polity,* Op.cit, p.278

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ ৭, সংখ্যা ২৫
জানুয়ারি- মার্চ : ২০১১

বায়' সালাম বিনিয়োগ পদ্ধতি : একটি পর্যালোচনা

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান*

[সারসংক্ষেপঃ ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতি রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও বিনিয়োগের ধরন অনুযায়ী শরী'আতের সীমার মধ্যে নানা পদ্ধতি অনুসরণ করে। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো শরী'আহ্ অনুমোদিত যেসব বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করে তন্মধ্যে বায়' সালাম (অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়) অন্যতম। কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে বিশেষ করে রপ্তানিমুখী শিল্পে চলতি মূলধন যোগানোর জন্য এ পদ্ধতি খুবই কার্যকর। স্থানীয় মৌসুমী ফসল ক্রয় করে এ পদ্ধতিতে কৃষি উৎপাদনেও সহায়তা করা যায়। বায়' সালাম বিনিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে একটি সমীক্ষা করাই এ গবেষণার উদ্দেশ্য। পাশাপাশি অন্যান্য উদ্দেশ্য হচ্ছে–

১. ব্যাংকার ও গ্রাহকগণের বায়' সালাম বিনিয়োগ পদ্ধতি বিষয়ক জ্ঞান ও সচেতনতা সম্পর্কে জানা;
২. বায়' সালাম পদ্ধতির প্রায়োগিক সমস্যা সম্পর্কে তথ্য লাভ করা;
৩. এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের পথে বিরাজিত সমস্যার সমাধান অন্বেষণ করা।]

বায়' সালাম এর পরিচয়

বায়' সালাম বিশেষ প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়। বায়' সালাম (بيع سلم) শব্দদ্বয় ইসমে মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ বিক্রয় করা, অগ্রগামী হওয়া, অগ্রবর্তী হওয়া[১] সামনা সামনি হওয়া ইত্যাদি। সহজ কথায় বায়' সালাম অর্থ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়। আরবি অভিধানে বায়' সালামকে বায়' সালাফ (سلف) বলা হয়।[২] হিজাজবাসীগণ সালাফ এবং ইরাকবাসীগণ সালাম বলে থাকেন।[৩] মূলত সালাম ও সালাফের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইংরেজিতে সালাম (Salam)-কে Pre payment[৪] Advance[৫]

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

payment, Forward buying ইত্যাদি বলা হয়। সালাম এমন একটি ক্রয়-বিক্রয় যার মাধ্যমে বিক্রেতা এই দায়িত্ব গ্রহণ করে যে, সে ভবিষ্যতের কোন একটি তারিখে নির্দিষ্ট জিনিস ক্রেতাকে সরবরাহ করবে এবং তার বিনিময়ে পূর্ণমূল্য বিক্রয়ের সময়ই অগ্রিম গ্রহণ করে।[৬] এক কথায় এর অর্থ ভবিষ্যতের কোন এক সময়ে মাল নেবার শর্তে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়।[৭] 'বায়' সালাম' এমন একটি বিক্রয় যেখানে বিক্রেতা (Seller) কোন নির্দিষ্ট পণ্য ভবিষ্যতের কোন নির্ধারিত সময়ে ক্রেতাকে সরবরাহ (Supply) দেয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে এবং বিনিময়ে দ্রব্যের অগ্রিম মূল্য চুক্তি সম্পাদনের সাথে সাথে পরিশোধ করে দেয়।

শরী'আতের পরিভাষায় ক্রেতা কর্তৃক মালের মূল্য বিক্রেতাকে অগ্রিম পরিশোধ করত বিক্রেতা কর্তৃক ভবিষ্যতের একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রেতার নিকট মাল হস্তান্তর করার মাধ্যমে যে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করা হয় তাকে বায়' সালাম (بيع سلم) বলে।[৮] এ পদ্ধতিতে মালের মূল্য বিক্রেতাকে আগে পরিশোধ করা হয় কিন্তু মাল বিক্রেতাকে হস্তান্তর করা হয় ভবিষ্যতের একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে।[৯] উল্লেখ্য যে, بيع سلم পদ্ধতি بيع مؤجل পদ্ধতির ঠিক বিপরীত।[১০]

ইসলামী ব্যাংকিং এর পরিভাষায়, 'বায়' সালাম' হলো এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে লিখিত চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংক পণ্যের দাম পণ্য বিক্রেতাকে অগ্রিম পরিশোধ করে এবং বিক্রেতা ভবিষ্যতের নির্ধারিত সময়ে বা সময়ের মধ্যে চুক্তির শর্তানুযায়ী ব্যাংকের কাছে পণ্য সরবরাহ করে।[১১] কৃষিজাত পণ্য ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে এ ব্যবসা খুবই উপযোগী।[১২] বায়' সালাম বিনিয়োগ পদ্ধতিতে ব্যাংক হচ্ছে পণ্যের ক্রেতা এবং বিনিয়োগ গ্রহীতা হচেছ পণ্যের বিক্রেতা।[১৩] বায়' সালাম চুক্তির বিক্রেতা চুক্তিকৃত মালামাল সরবরাহের জন্য যদি তৃতীয় কোন বিক্রেতার সাথে প্রথম চুক্তির অনুরূপ মালামাল সংগ্রহের জন্য অন্য একটি পৃথক সালাম চুক্তি সম্পাদন করে তবে দ্বিতীয় চুক্তিটিকে প্যারালেল (Parallel) চুক্তি বলে।[১৪]

বায়' সালাম পদ্ধতিকে একটি উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরা যেতে পারে। ধরা যাক, আব্দুর রহমান (একজন কৃষক) এর জমি আছে কিন্তু চাষ করার মত যথেষ্ট মূলধন এ মুহূর্তে তার নেই। শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড- এর কাছে সে সার, বীজ, কীটনাশক ক্রয় বাবদ নগদ ১ লক্ষ টাকা প্রদানের আবেদন করলো। বিনিময়ে সে ব্যাংককে তিন মাস পর ১০ টন ধান দিতে চাইলো। ব্যাংক আব্দুর রহমান সাহেবের প্রস্তাবে রাজী হয়ে ১০ টন ধান তিন মাস পর নেয়ার শর্তে ১ লক্ষ টাকা অগ্রিম প্রদান করলো। এ ধরনের অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়কে মূলত বায়' সালাম (بيع سلم) বলে।

রপ্তানিমুখী শিল্পে বায়' সালাম পদ্ধতিতে বর্তমানে বেশি বিনিয়োগ হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে ক্রয় মূল্যের হিসাব নির্ধারণ নিম্নরূপ :

১. গ্রাহকের নাম : মেসার্স করিম ইন্টারপ্রাইজ
২. বিনিয়োগ হিসাব নাম্বার :
৩. রপ্তানি ঋণপত্রের বিবরণ :

ক. ঋণপত্র (LC) নাম্বার :
খ. এলসির শেষ তারিখ :
গ. ঋণপত্রের মূল্য : এফসি (FC) .... টাকা...........
ঘ. পণ্যের নাম :
ঙ. ইউনিট (একক) :
চ. ইউনিট মূল্য : এফসি (FC) .... টাকা...........

৪. প্রার্থিত বিনিয়োগের পরিমাণ : টাকা : ....
৫. বিনিয়োগের মেয়াদ :
৬. কাঙ্ক্ষিত মুনাফার হার : (R.R) :
৭. ইউনিট প্রতি ক্রয়মূল্য : যেমন-

১২০০ X বিক্রয় (রপ্তানি,Export) মূল্য ইউনিট প্রতি
১২০০+(কাঙ্ক্ষিত মুনাফার হার, RR X সময়, মাসের হিসাবে)

৮. বিক্রিত পণের ইউনিট সংখ্যা : (বিনিয়োগের পরিমাণ/ ইউনিট প্রতি ক্রয়মূল্য)
৯. মোট বিক্রয় মূল্য : (ক্রীত ইউনিটের সংখ্যা X ইউনিট প্রতি রপ্তানি মূল্য)
১০. মুনাফা / লাভ (মোট বিক্রয়মূল্য-বিনিয়োগের পরিমাণ)

শরীআহর দৃষ্টিতে বায়' সালাম

কুরআন, হাদীস, ইজমায়ে উম্মত ও কিয়াসের মাধ্যমে বায়'সালাম (بيع سلم) বৈধ বলে প্রমাণিত হয়েছে।[১৫] নিম্নে এ সম্পর্কে দলীল উপস্থাপন করা হল–

আল কুরআন

আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে ঋণের আদান প্রদান করো, তখন তা লিপিবদ্ধ করে রাখ।"[১৬] ফুকাহায়ে কিরাম এ আয়াতকে বায়' সালামের (بيع سلم) বৈধতার অনুকূলে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। ইব্‌ন আব্বাস রা. এ পদ্ধতিকে হালাল বলে উল্লেখ করার উপর্যুক্ত

আয়াতটি পাঠ করে বৈধ হিসেবে দলীল পেশ করেছেন।[১৭] আয়াতে দাইন শব্দটি আ'ম– যা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য ক্রয়-বিক্রয়কেও অন্তর্ভুক্ত করে। ইব্‌ন আব্বাস রা. দাইন দ্বারা দাইনুস সালামকে বুঝিয়েছেন। এছাড়া অন্যত্র আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন।"[১৮] এ আয়াত দ্বারা নগদ বাকি ও অগ্রিম সকল প্রকার ক্রয়-বিক্রয়কে বুঝানো হয়েছে।

আল হাদীস

হাদীসে বায়' সালাম (بيع سلم) এর বৈধতার বিষয়ে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে, এর জন্য পণ্যের গুণাগুণ, পরিমাণ ও মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকতে হবে।[১৯]

ইব্‌ন আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. যখন মদীনায় পদার্পণ করেন, তখন মদীনাবাসীগণ দুই ও তিন বছর মেয়াদে বিভিন্ন প্রকার ফল অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় করতো। তা দেখে রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, 'যে ব্যক্তি অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় করবে সে যেন নির্ধারিত পরিমাণ, নির্ধারিত ওজন এবং নির্ধারিত মেয়াদের জন্য তা করে'।[২০]

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আওফ রা. বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ স. এর যুগে এবং আবু বকর রা. ও উমর রা. এর যুগে অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় করতাম।[২১] এ বিষয়ে আরো বহু হাদীস রয়েছে। যেসব জিনিসের পরিমাণ, বৈশিষ্ট্য, অবস্থা, প্রকৃতি ও ধরন নির্ধারণ করা যায় সেগুলোর এবং খাদ্য শস্য, কাপড় ইত্যাদি বস্তু বায়' সালাম বৈধ, তবে পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ, গুণাগুণ পণ্য সরবরাহের তারিখ ইত্যাদি অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে, যাতে পরবর্তীতে বিতর্কের সৃষ্টি না হয়।[২২]

হানাফী মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবে নির্দিষ্ট পরিমাপ, সময় ও ওজনের শর্ত করা হয়নি, তবে স্বল্প সময়ের জন্য অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়কে বৈধ বলা হয়েছে।[২৩]

আল ইজমা

বায়' সালাম বৈধ হবার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কেননা এ পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করার ব্যাপারে মানুষের ব্যাপক প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে যারা কৃষিকাজ, ফলের বাগান ও এ ধরনের ব্যবসা করে তারা বায়' সালাম (بيع سلم) এর মুখাপেক্ষী হয়। আর এ সকল পদ্ধতির ক্ষেত্রে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিয়োগ করা বৈধ। এ পদ্ধতি কিয়াসেরও বিরোধী নয়। যেহেতু এর মাধ্যমে মানুষের প্রভূত উপকার সাধিত হয়, তাই এ পদ্ধতি কিয়াস অনুমোদন করে।[২৪] মোটকথা, শরী'আতে এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ বৈধ।

বায়' সালাম-এর শর্তাবলী

বায়' সালাম পদ্ধতি বৈধ হওয়ার জন্য কতগুলো শর্ত রয়েছে, যার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো-[২৫]

১. বায়' সালাম পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় একটি লিখিত চুক্তি করতে হবে। এ ব্যাপারে আল কুরআনে এসেছে, "হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও.... ।"[২৬]

২. চুক্তি স্বাক্ষরের পর চুক্তি অনুসারে মালের সম্পূর্ণ মূল্য বিক্রেতাকে পরিশোধ করে দিতে হবে। তবে উল্লেখ থাকলে মালের সরবরাহ পর্যায়ক্রমেও গ্রহণ করা যাবে।[২৭]

৩. চুক্তিপত্রে পণ্যের নাম, পরিমাণ, গুণাগুণ, দাম, পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি, পণ্য সরবরাহের সময়, স্থান ও ধরন ইত্যাদি সকল শর্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। হাদীসে উল্লেখ আছে, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. যখন হিজরত করে মদীনায় পৌছালেন তখন মদীনাবাসী দুই কিংবা তিন বছরের মেয়াদে অগ্রিম বিভিন্ন ফল ক্রয়-বিক্রয় করত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, কোন ব্যক্তি অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করলে সে যেন নির্দিষ্ট মাপে এবং নির্দিষ্ট ওজনে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে বায়ে' সালাম করে।"[২৮]

৪. অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির মেয়াদোত্তীর্ণের পূর্বে ক্রেতা বা বিক্রেতা কোন পক্ষই একক ভাবে চুক্তি বাতিল করতে পারবে না। হাদীসে এসেছে, ইব্ন উমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন : ক্রেতা ও বিক্রেতা প্রত্যেকেরই একে অপরের উপর (ক্রয়-বিক্রয়) বাতিল করার এখ্তিয়ার আছে যতক্ষণ তারা একে অপরের থেকে আলাদা না হয় (তবে শর্তাধীনে ক্রয়-বিক্রয় হলে স্বতন্ত্র কথা)।"[২৯]

৫. চুক্তিপত্রে ইসলামী শরীআহ পরিপন্থী কোন শর্তারোপ করা যাবে না। হাদীসে এসেছে, 'আয়িশা রা. বলেন, বারীরা রা. আমার কাছে এসে বলল, আমি আমার মালিক পক্ষের সাথে নয় উকিয়া দেয়ার শর্তে মুকাতাবা (নিজের দাস-দাসীকে কোন কিছুর বিনিময়ে মুক্ত করার চুক্তিকে মুকাতাবা বলে) করেছি--প্রতি বছর যা থেকে এক উকিয়া (এক উকিয়া ৪০ দিরহামের সমপরিমাণ) করে দেয়া হবে। আপনি (এ ব্যাপারে) আমাকে সাহায্য করুন। আমি বললাম, যদি তোমার মালিক পক্ষ পছন্দ করে যে, আমি তাদের একবারেই তা পরিশোধ করব এবং তোমার ওয়ালা-এর অধিকার আমার হবে, তবে আমি তা করব। তখন বারীরা

রা. তার মালিকের নিকট গেল এবং তাদের তা বলল। তারা তা অস্বীকার করল। বারীরা রা. তাদের নিকট থেকে (আবার আমার কাছে) এল। আর তখন রসূলুল্লাহ্ স. সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সে বলল, আমি (আপনার) সে কথা তাদের কাছে পেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা নিজেদের জন্য ওয়ালার অধিকার সংরক্ষণ ছাড়া রাজি হয়নি। নবী স. তা শুনলেন। আয়িশা রা. নবী স.-কে তা সবিস্তারে জানালেন। তিনি বললেন, তুমি তাকে নিয়ে নাও এবং তাদের জন্য ওয়ালার শর্ত মেনে নাও। কেননা, ওয়ালা এর হক তারই, যে আযাদ করে। আয়িশা রা. তাই করলেন। এরপর রসূলুল্লাহ্ স. জনসম্মুখে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র হাম্‌দ ও ছানা বর্ণনা করেন। তারপর বললেন, লোকদের কী হল যে, তারা এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহ্র বিধানে নেই। আল্লাহ্র বিধানে যে শর্তের উল্লেখ নেই, তা বাতিল বলে গণ্য হবে, শত শর্ত হলেও। আল্লাহ্র ফয়সালাই সঠিক, আল্লাহ্র শর্তই সুদৃঢ়। ওয়ালার হক তো তারই, যে আযাদ করে।"[৩০]

৬. বায়' সালাম পদ্ধতিতে ক্রেতা এবং বিক্রেতাকে অবশ্যই বালেগ এবং বিক্রয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে।

৭. বায়' সালাম পদ্ধতিতে কোন বস্তু অগ্রিম ক্রয় করার পর সে বস্তু ক্রেতা কর্তৃক হস্তগত করার পূর্বে অপরের নিকট বিক্রয় করতে পারবে না। হাদীসে এসেছে, "আবূ সাঈদ খুদরী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন দ্রব্য অগ্রিম বিক্রয় করবে, সে তা আর কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করতে পারবে না।"[৩১]

৮. মালের পরিবহণ খচর, বীমা, গুদামজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে যদি কোন শর্ত থাকে তবে তা অবশ্যই চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে।

৯. বায়' সালামে পণ্যের পরিবহণ খরচ মূল্য এবং লাভ আলাদাভাবে উল্লেখ করা জরুরি নয়, তবে মুরাবাহা বায়' সালাম এর ক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হবে।

১০. বায়' সালাম পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য অবশ্যই হালাল হতে হবে। যেমন হাদীসে এসেছে, "আয়িশা রা. বলেন. যখন সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো (সুদ হারাম হওয়ার) নাযিল হল তখন নবী স. ঘর হতে বের হয়ে (সুদ হারাম হওয়ার ঘোষণা শুনালেন, তখন মদ পান হারাম হওয়া পুনঃ ঘোষণা করত) বললেন, মদের ব্যবসা হারাম করা হয়েছে।[৩২] অন্য হাদীসে এসেছে, "আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা মদ এবং এর মূল্য গ্রহণকে হারাম করেছেন, মৃত জীব জন্তু এবং এর মূল্য গ্রহণকে হারাম করেছেন এবং শুকর ও এর মূল্য গ্রহণকে হারাম করেছেন।"[৩৩]

ইসলামী ব্যাংকিং-এ বায়' সালাম বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যাবলী[৩৪]

১. তহবিলের অভাবে যাতে উৎপাদন বিঘ্নিত না হয় সে জন্য সাধারণত এ পদ্ধতিতে ব্যাংক শিল্প ও কৃষিপণ্যের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থায়ন করে উৎপাদনের গতিকে সচল রাখা হয়।

২. এ পদ্ধতিতে ব্যাংক হচ্ছে ক্রেতা এবং গ্রাহক বিক্রেতা।

৩. ব্যাংক এ ধরনের চুক্তি সম্পাদনের পর গ্রাহককে মালের অগ্রিম মূল্য বাবদ অর্থের যোগান দেয়।

৪. অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতাকে যে অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করা হবে তা বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার নিকট মাল হস্তান্তর না করা পর্যন্ত বিক্রেতার নিকট ঋণ হিসেবে গণ্য হবে।

৫. ব্যাংক এ ধরনের চুক্তি সম্পাদনের সময় পণ্যের গুণগত মান, পরিমাণ, সরবরাহের সময়, স্থান ও ধরন ঠিক করে নেয়।[৩৫]

৬. চুক্তি পত্রের শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট পণ্য সরবরাহ করলে ক্রেতা তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতে পারবে না, তবে চুক্তি পত্রের শর্তবহির্ভূত পণ্য সরবরাহ করলে বিক্রেতাকে শর্তানুযায়ী পণ্য সরবরাহের জন্য বাধ্য করতে পারবে।

৭. বায়' সালাম পদ্ধতিতে পণ্য সরবরাহের সময় যদি দেখা যায়, পণ্যের পরিমাণ পরিশোধিত মূল্যের তুলনায় বেশি হয় তাহলে ক্রেতা বিক্রেতাকে অতিরিক্ত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। অথবা অতিরিক্ত পণ্য ফেরত দিবে। আর যদি পণ্যের পরিমাণ পূর্ব নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম হয় তাহলে বিক্রেতা ক্রেতাকে যতটুকু পণ্য কম দিয়েছে ততটুকু পণ্য বা তার মূল্য ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

৮. যে পণ্যের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে চুক্তি সম্পাদনের সময় হতে পণ্য হস্তান্তরের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাজারে সে পণ্য সহজলভ্য হতে হবে। পণ্য বাকী না রেখে তৎক্ষণাৎ হস্তান্তরের শর্ত করা হলে অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

৯. ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের সম্মতিতে চুক্তি সম্পাদনের সময় মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

১০. গ্রাহক চুক্তির শর্তানুযায়ী মূল্য অগ্রিম গ্রহণের প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সময়ে কিস্তিতে বা এককালীন পণ্য সরবরাহ করে। এবং ব্যাংক এ পণ্য গ্রহণ করে যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করতে পারে।

১১. ব্যাংক নির্দিষ্ট সময়ে পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার স্বার্থে গ্রাহকের নিকট থেকে অথবা তার পক্ষে তৃতীয় পক্ষের নিকট থেকে সহায়ক, ব্যক্তিগত ও অন্যান্য জামানত গ্রহণ করতে পারে।

১২. বায়' সালাম পদ্ধতিতে কেবল ফানজিবল (Fungible) অর্থাৎ খাদ্য শস্য, কাপড় এবং ঐ সকল জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ যেগুলোর গুণাগুণ, অবস্থা, ধরন ও পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব। জীবজন্তু, মণিমুক্তা ইত্যাদির অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়।

বায়' সালাম বিনিয়োগ পদ্ধতির প্রায়োগিক সমস্যা সমাধানে ব্যাংকার ও গ্রাহক

ঢাকায় অবস্থিত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলোর মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২৫ টি শাখা, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর ১৩ টি শাখা, আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড(সাবেক দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড)-এর ১১ টি শাখা, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর ১০ টি শাখা, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড-এর ৯ টি শাখা ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর ৩ টি শাখা সর্বমোট ৭১ টি শাখা এবং ব্যাংকগুলোর সর্বমোট ৪৭জন গ্রাহকের উপর জরিপ চালিয়ে এ তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল হিসেবে সরাসরি সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং আবদ্ধ ও উন্মুক্ত প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় সম্পাদনার পর সাংকেতীকরণের (Coding) মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত যথাযথভাবে সারণিবদ্ধ করে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

সারণি-১ : বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকারের বায়' সালাম পদ্ধতি অনুসরণ সংক্রান্ত তথ্যের সারণি

গৃহীত বিনিয়োগ পদ্ধতি	গণসংখ্যা (N=৭১)*	শতকরা (%) হার
বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকার বায়' সালাম পদ্ধতি অনুসরণ করে	২৬	৩৬.৬২
বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকার বায়' সালাম পদ্ধতি অনুসরণ করে না	৪৫	৬৩.৩৮

*N= গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত জনসংখ্যার পরিমাণ।

আলোচিত সারণি বিশ্লেষণের মাধ্যমে লক্ষ্য করা যায়, ৭১ টি শাখার মধ্যে মাত্র ২৬টি শাখা অর্থাৎ ৩৬.৬২ শতাংশ শাখা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বায়' সালাম পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং ৬৩.৩৮ শতাংশ শাখা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অনুসরণ করে না।

সারণি-২ : বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বায়' সালাম পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় কিনা সে সংক্রান্ত তথ্যের বিবরণী:

উত্তরের ধরন	গণসংখ্যা (N=২৬)	শতকরা (%) হার
বায়' সালাম পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়	২৬	১০০
বায়' সালাম পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয় না	০	০

উপর্যুক্ত ছক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, ব্যাংকারদের শতকরা ১০০ জনই মনে করেন, বায়' সালাম পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা যায়।

সারণি-৩ : বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বায়' সালাম পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সে সংক্রান্ত তথ্যাবলি

সমস্যার ধরন	গণসংখ্যা (N=২৬)	শতকরা (%) হার
ব্যাংকে বায়' সালাম পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ কম। কেননা এ পদ্ধতি রপ্তানি (Export) ও কৃষি ক্ষেত্রে (Agricultural Sector) অনুসরণ করা হয়	২৪	৯২.৩১
বায়' সালাম অপেক্ষাকৃত ঝুঁকিপূর্ণ, কেননা পণ্য প্রস্তুত ও সরবরাহের পূর্বেই মূল্য পরিশোধ করতে হয়	২২	৮৪.৬২
বায়' সালাম পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রাহকের ধারণা কম	২২	৮৪.৬২
কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে বিনিয়োগের জন্য গ্রাহকের উপর নির্ভরশীল হতে হয়	২০	৭৬.৯২
Deal to Deal হিসাব সংরক্ষণ করা কষ্টকর	১৮	৬৯.২৩
পণ্য রপ্তানি করতে ব্যর্থ হলে বায়' সালামে বিনিয়োজিত অর্থ আদায় করা কঠিন অনেক ক্ষেত্রে আদায় হয় না	২০	৭৬.৯২
Shipment Time নির্দিষ্ট থাকার পরে রপ্তানি করলে Buyer Bank ডকুমেন্টস (Documents) Discrepancy প্রদর্শন করে। এ ক্ষেত্রে পরে Payment দিলে	২৩	৮৮.৪৬

Discrepancy Charge কর্তন করে		
বায়' সালাম পদ্ধতিতে কৃষি পণ্যে বিনিয়োগ করলে অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের (Natural Calamity) কারণে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে বিনিয়োগকৃত অর্থ আদায়ে সমস্যা দেখা দেয়	১৭	৬৫.৩৮
অন্যান্য (নির্দিষ্টকরণ) **	৬	২৩.০৮

* গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত জনসংখ্যা কর্তৃক একাধিক উত্তর প্রদানের কারণে মোট শতকরা হার ১০০ এর বেশি ।

** গ্রাহকগণ বায়' সালাম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ নিতে আগ্রহী নয়, কৃষি ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির বিনিয়োগ বিশেষ এলাকাভিত্তিক, মৌসুম নির্ভর এবং এই পদ্ধতিতে পণ্য গ্রহণের সময় ব্যাংকের অফিসার অনেক ক্ষেত্রে সশরীরে উপস্থিত থাকতে পারে না।

আলোচ্য সারণি বিশ্লেষণে দেখা যায়, বায়' সালাম পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শতকরা ৯২.৩১ জন ব্যাংকার ব্যাংকে বায়' সালাম পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ কম বলে মত প্রকাশ করেছেন। কেননা এ পদ্ধতি রপ্তানি (Export) ও কৃষি ক্ষেত্রে (Agricultural Sector) অনুসরণ করা হয় বিধায় এটাকে বড় ধরনের সমস্যা মনে করা হয়। শতকরা ৮৮.৪৬ জন ব্যাংকার, Shipment Time নির্দিষ্ট থাকার পরে রপ্তানি করলে Buyer Bank ডকুমেন্টস (Documents) Discrepancy প্রদর্শন করে। এ ক্ষেত্রে পরে Payment দিলে Discrepancy Charge কর্তন করাকে সমস্যা হিসেবে দেখিয়েছেন। অন্যদিকে শতকরা ৮৪.৬২ জন ব্যাংকার-এর মত বায়' সালাম অপেক্ষাকৃত ঝুঁকিপূর্ণ; কেননা পণ্য প্রস্তুত ও সরবরাহের পূর্বেই মূল্য পরিশোধ করতে হয়। তাঁরা বায়' সালাম পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রাহকের ধারণা কম বলে মনে করেন। এছাড়া কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে বিনিয়োগের জন্য গ্রাহকের উপর নির্ভরশীল হতে হয় ও পণ্য রপ্তানি করতে ব্যর্থ হলে বায়' সালামে বিনিয়োজিত অর্থ আদায় করা কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে আদায় হয় না বলে শতকরা ৭৬.৯২ জন ব্যাংকার এ পদ্ধতি অনুসরণকে সমস্যা হিসেবে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। Deal to Deal হিসাব সংরক্ষণ করা কষ্টকর এবং বায়' সালাম পদ্ধতিতে কৃষি পণ্যে বিনিয়োগ করলে অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের (Natural Calamity) কারণে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে বিনিয়োগকৃত অর্থ আদায়ে সমস্যা দেখা দেয় বলে যথাক্রমে শতকরা ৬৯.২৩ জন ও ৬৫.৩৮ জন ব্যাংকার মতামত প্রকাশ করেছেন।

সারণি-৪ : বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বায়' সালাম পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার সম্ভাব্য সমাধান সংক্রান্ত মতামত

সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায়	গণসংখ্যা (N=২৬)	শতকরা (%) হার
বায়' সালামের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচন করা	২৪	৯২.৩১
আমানতদার ও সৎ বিক্রেতা/সরবরাহকারী নির্বাচন করা	২২	৮৪.৬২
নিয়মিত তত্ত্বাবধানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাঠকর্মী নিযুক্ত করা (রপ্তানি ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রে)	২২	৮৪.৬২
বিনিয়োগ গ্রহীতাকে বায়' সালাম পদ্ধতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করা	২৩	৮৮.৪৬
Shipping line এ বুকিং দিয়ে সময়মত Shipment করা	২২	৮৪.৬২
পণ্য সরবরাহের জন্য Time Schedule তৈরি করে দেয়া	২২	৮৪.৬২
Quantity, Quality এবং Specipication সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা	২২	৮৪.৬২
বায়' সালাম পদ্ধতিতে কৃষি পণ্যে বিনিয়োগ করলে অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেক্ষেত্রে বিনিয়োজিত কৃষি পণ্যে ইসলামী বীমার মাধ্যমে কিছুটা হলেও ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করা	২২	৮৪.৬২
অন্যান্য (নির্দিষ্টকরণ) **	০	০

* গবেষণার অন্তর্ভুক্ত জনসংখ্যা কর্তৃক একাধিক উত্তর প্রদানের কারণে মোট শতকরা হার ১০০ এর বেশি ।

উপরোক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বায়' সালাম পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হয় তার সম্ভাব্য সমাধানের উপায় হিসেবে শতকরা ৯২.৩১ জন ব্যাংকার বায়' সালামের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন এবং ব্যাংকের সকল শাখা এ পদ্ধতির মাধ্যমে বিনিয়োগ করলে জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ উপকৃত হবে বা সুবিধার আওতায় আসবে বলে তারা মনে করেন। অন্যদিকে শতকরা ৮৮.৪৬ জন ব্যাংকার, গ্রাহক সমাবেশ, ব্যক্তিগত আলাপচারিতা, মিডিয়ায় প্রচার ইত্যাদির মাধ্যমে বিনিয়োগ গ্রহীতাকে বায়' সালাম পদ্ধতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। এছাড়া আমানতদার ও সৎ বিক্রেতা/সরবরাহকারী নির্বাচন করা, নিয়মিত তত্ত্বাবধানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাঠকর্মী নিযুক্ত করা (রপ্তানি ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রে), Shipping line এ বুকিং দিয়ে সময়মত Shipment করা, পণ্য সরবরাহের জন্য Time

Schedule তৈরি করে দেয়া, Quantity, Quality এবং Specipication সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও বায়' সালাম পদ্ধতিতে কৃষি পণ্যে বিনিয়োগ করলে অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের (Natural Calamity) কারণে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেক্ষেত্রে বিনিয়োজিত কৃষি পণ্যে ইসলামী বীমার মাধ্যমে কিছুটা হলেও ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করার অভিমত ব্যক্ত করেছেন শতকরা ৮৪.৬২ জন ব্যাংকার।

সারণি-৫ : বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের বায়' সালাম পদ্ধতি অনুসরণ সংক্রান্ত তথ্যের সারণি

গৃহীত বিনিয়োগ পদ্ধতি	গণসংখ্যা (N=৪৭)*	শতকরা (%) হার
বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রাহক বায়' সালাম পদ্ধতি অনুসরণ করে	১১	২৩.৪০
বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রাহক বায়' সালাম পদ্ধতি অনুসরণ করে না	৩৬	৭৬.৬০

* N= গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত জনসংখ্যার পরিমাণ।

আলোচিত সারণি বিশ্লেষণের মাধ্যমে লক্ষ্য করা যায়, ৪৭ জন গ্রাহকের মধ্যে মাত্র ১১ জন অর্থাৎ ২৩.৪০ শতাংশ গ্রাহক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বায়' সালাম পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং ৭৬.৬০ শতাংশ গ্রাহক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অনুসরণ করে না।

সারণি-৬ : বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বায়' সালাম পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় কিনা সে সংক্রান্ত তথ্যের বিবরণী

উত্তরের ধরন	গণসংখ্যা (N=১১)	শতকরা (%) হার
বায়' সালাম পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়	১১	১০০
বায়' সালাম পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয় না	০	০

উপরোক্ত ছক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, গ্রাহকদের শতকরা ১০০ জনই মনে করেন বায়' সালাম পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা লক্ষ্য করা যায়।

সারণি-৭ : বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বায়' সালাম পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সে সংক্রান্ত তথ্যাবলী

সমস্যার ধরন	গণসংখ্যা (N=১১)	শতকরা হার (%)
ব্যাংক বায়' সালাম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করতে অনাগ্রহী কেননা মুনাফার হার তুলনামূলক কম	৯	৮১.৮২
ব্যাংক বাজার দামের (Export rate) চেয়ে কম দামে পণ্য ক্রয়ের প্রস্তাব দেয়	২	১৮.১৮
বায়' সালাম পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাংক কর্মকর্তাদের তাত্ত্বিক ধারণা স্বচ্ছ নয়	৮	৭২.৭৩
এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে ব্যাংক ঝুঁকি গ্রহণ করতে চায় না	৯	৮১.৮২
ব্যাংক পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রিম হিসেবে পরিশোধে রাজী হয় না ফলে অর্থ সংকট থেকেই যায়	৯	৮১.৮২
জনসাধারণ বায়' সালাম পদ্ধতি সম্পর্কে বেশি অবহিত নয়	৮	৭২.৭৩
প্রচলিত ব্যাংকের তুলনায় আনুষ্ঠানিকতা বেশি ও অধিক মাত্রায় চার্জ ডকুমেন্ট পূরণ করা হয়	৮	৭২.৭৩
অন্যান্য (নির্দিষ্টকরণ) **	৪	৩৬.৩৬

আলোচ্য সারণি বিশ্লেষণে দেখা যায়, বায়' সালাম পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শতকরা ৮১.৮২ জন গ্রাহক, ব্যাংক বায়' সালাম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করতে অনাগ্রহী, কেননা এ পদ্ধতিতে মুনাফার হার অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় কম, এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে ব্যাংক ঝুঁকি গ্রহণ করতে চায় না এবং ব্যাংক পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রিম হিসেবে পরিশোধে রাজী হয় না ফলে অর্থ সংকট থেকে যাওয়াকে বড় ধরনের সমস্যা বলে মত প্রকাশ করেছেন ব্যাংকারগণ। শতকরা ৭২.৭৩ জন গ্রাহক, প্রচলিত ব্যাংকের তুলনায় আনুষ্ঠানিকতা বেশি ও অধিক মাত্রায় চার্জ ডকুমেন্ট পূরণ করা হয়, বায়' সালাম পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাংক কর্মকর্তাদের তাত্ত্বিক ধারণা স্বচ্ছ নয় এবং জনসাধারণও বায়' সালাম পদ্ধতি সম্পর্কে বেশি অবহিত নয় বলে এগুলোকে সমস্যা হিসেবে দেখা হয়। অন্যদিকে শতকরা ৩৬.৩৬ জন গ্রাহকের মতে, অনেক সময় গ্রাহকের প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ব্যাংক কর্তৃক এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ পাওয়া যায় না ফলে

উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মূল Export অর্ডারের সর্বোচ্চ পরিমাণ অংশ বায়' সালাম হিসেবে ব্যাংক ক্রয় করতে উৎসাহিত হয় না এবং বায়' সালাম পদ্ধতিতে চুক্তির প্রক্রিয়া সহজবোধ্য নয়। এছাড়া ব্যাংক বাজার দামের (Export rate) চেয়ে কম দামে পণ্য ক্রয়ের প্রস্তাব দেয়াকে শতকরা ১৮.৮২ জন গ্রাহক এ পদ্ধতিকে সমস্যা হিসেবে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

* গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত জনসংখ্যা কর্তৃক একাধিক উত্তর প্রদানের কারণে মোট শতকরা হার ১০০ এর বেশি।

** অনেক সময় গ্রাহকের প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ব্যাংক কর্তৃক এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ পাওয়া যায় না ফলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মূল Export অর্ডারের সর্বোচ্চ পরিমাণ অংশ বায়' সালাম হিসেবে ব্যাংক ক্রয় করতে উৎসাহিত হয় না এবং বায়' সালাম পদ্ধতিতে চুক্তির প্রক্রিয়া সহজবোধ্য নয়।

সারণি-৮ : বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বায়' সালাম পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার সম্ভাব্য সমাধান সংক্রান্ত মতামত

সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায়	গণসংখ্যা (N=১১)	শতকরা (%) হার
ব্যাংক পক্ষকে বায়' সালাম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করতে সত্যিকার অর্থে আগ্রহী হওয়া	৯	৮১.৮২
বাজার দামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পণ্য ক্রয়ের প্রস্তাব দেয়া	২	১৮.১৮
উপযুক্ত ট্রেনিং-এর মাধ্যমে ব্যাংক কর্মকর্তাদের বায়' সালাম পদ্ধতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করা	৮	৭২.৭৩
ব্যাংক পক্ষকে ঝুঁকি গ্রহণে আগ্রহী হওয়া	৯	৮১.৮২
ব্যাংককে পণ্যের সর্বোচ্চ পরিমাণ মূল্য অগ্রিম হিসেবে পরিশোধে রাজী হওয়া	৯	৮১.৮২
জনসাধারণকে বায়' সালাম পদ্ধতি সম্পর্কে আরো বেশি অবহিত করা	৮	৭২.৭৩
যথাসম্ভব কম আনুষ্ঠানিকতা অবলম্বন করা ও স্বাভাবিক মাত্রায় চার্জ ডকুমেন্ট পূরণ করা	৮	৭২.৭৩
অন্যান্য (নির্দিষ্টকরণ) **	৪	৩৬.৩৬

* গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত জনসংখ্যা কর্তৃক একাধিক উত্তর প্রদানের কারণে মোট শতকরা হার ১০০ এর বেশি।

**উৎপাদনে সহায়তার জন্য গ্রাহকের প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ব্যাংক কর্তৃক এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান করা, ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে মূল Export অর্ডারের সর্বোচ্চ পরিমাণ অংশ বায়' সালাম হিসেবে বিনিয়োগে আগ্রহী হওয়া এবং বায়' সালাম পদ্ধতিতে চুক্তির প্রক্রিয়া সহজবোধ্য ও সাবলীল করা।

উপরোক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বায়' সালাম পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হয় তার সম্ভাব্য সমাধানের উপায় হিসেবে সর্বোচ্চ শতকরা ৮১.৮২ জন গ্রাহক, ব্যাংক পক্ষকে বায়' সালাম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করতে সত্যিকার অর্থে আগ্রহী হওয়া, ব্যাংক পক্ষকে ঝুঁকি গ্রহণে আগ্রহী হওয়া এবং পণ্যের সর্বোচ্চ পরিমাণ মূল্য অগ্রিম হিসেবে পরিশোধে রাজী হওয়ার কথা বলেছেন। অন্যদিকে শতকরা ৭২.৭৩ জন গ্রাহক, উপযুক্ত ট্রেনিং-এর মাধ্যমে ব্যাংক কর্মকর্তাদের বায়' সালাম পদ্ধতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করা, যথাসম্ভব কম আনুষ্ঠানিকতা অবলম্বন করা ও স্বাভাবিক মাত্রায় চার্জ ডকুমেন্ট পূরণ করা এবং গ্রাহক সমাবেশ, ব্যক্তিগত আলাপচারিতা, মিডিয়ায় প্রচার ইত্যাদির মাধ্যমে বিনিয়োগ গ্রহীতাকে বায়' সালাম পদ্ধতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করার প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন। উৎপাদনে সহায়তার জন্য গ্রাহকের প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ব্যাংক কর্তৃক এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান করা, ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে মূল Export অর্ডারের সর্বোচ্চ পরিমাণ অংশ বায়' সালাম হিসেবে বিনিয়োগে আগ্রহী হওয়া এবং বায়' সালাম পদ্ধতিতে চুক্তির প্রক্রিয়া সহজ ও সাবলীল করার অভিমত ব্যক্ত করেছেন শতকরা ৩৬.৩৬ জন গ্রাহক। এছাড়া শতকরা ১৮.১৮ জন গ্রাহক ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে বাজার দামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পণ্য ক্রয়ের প্রস্তাব দেয়ার কথা বলেছেন।

উপসংহার

ইসলামী ব্যাংকে অনুসৃত বায়' সালাম বিনিয়োগ পদ্ধতির তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক আলোচনা শেষে এটা সুস্পষ্ট যে, এই পদ্ধতিতে পুঁজি সরবরাহকারী প্রকৃত সম্পদ অর্জন করে তা বাজারে বিক্রয় করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে পারে। আবার বিক্রেতাও পণ্যের অগ্রিম মূল্য পেয়ে উপকৃত হতে পারে। তবে ইসলামী ব্যাংকসমূহে বায়' সালাম পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, ব্যাংকার ও গ্রাহকগণের এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগের হার সন্তোষজনক নয়।। তবে বাংলাদেশের বিরাট জনগোষ্ঠী

কৃষি নির্ভর হওয়ায় বায়' সালাম পদ্ধতির বাস্তবায়ন ঘটালে একদিকে দরিদ্র কৃষক কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে সক্ষম হবে তেমনিভাবে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ব্যবসাও সম্প্রসারিত হবে। অন্যদিকে এই পদ্ধতিতে অর্থায়নের মাধ্যমে রপ্তানি শিল্পে এবং এদেশের শিল্পায়নে সমূহ সম্ভবনার দ্বার উন্মোচিত হবে। সাথে সাথে এই পদ্ধতি ব্যাপক কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগও এনে দেবে।

তথ্যনির্দেশ

১. আল জাযায়িরী, আব্দুর রহমান, *কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবাআহ্*, বৈরুত: দারুল ইলমিয়্যাহ্, তা. বি., খ. ২, পৃ. ২৭২

২. Hasanuz Zaman, S. M. "*Bay Salam: Principles and practical Application*", Islamic Studies, Quarterly Journal, vol- 30, N-4, winter, 1991, Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad, Pakistan, p. 443; বালাবাকী, ড. রুহী, *আল-মাওরিদ*, বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালাইন, ১৯৯৯, পৃ. ৬৪১; আল-কাসানী, ইমাম, *বাদাইউস্ সানাই' ফী তারতীবিশ-শারায়ী'*, করাচি: এম সাঈদ কোম্পানি, ১৪০০ হি., খ. ৫, পৃ. ২০১

৩. আল-'আসকালানী, ইব্ন হাজার, *বুলুগুল মারাম*, রিয়াদ: মাকতাবাতু দারুস সালাম ১৯৯৬, পৃ. ২৪৯

৪. বালবাকী, ড. রুহী, *আল-মাওরিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪১

৫. "Bai-Salam" means advance sale and purchase. Manual for Invesment under Bai Salam Mode, p. 1

৬. তাকী উসমানী, মুফতী মুহাম্মাদ, অনু: মুফতী মুহাম্মাদ জাবের হোসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি : সমস্যা ও সমাধান*, ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০০৫, পৃ. ১৭৮-৭৯

৭. Ray, Nicholas Dylan, *Arab Islamic Banking and the Renewal of Islamic Law*, London: /Boston: Graham and Trotman, 1995, p. 32

৮. Islam, Zohurul, *Islamic Economics*, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1987, p. 118; সম্পাদনা পরিষদ, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গবেষণা বিভাগ, ১৯৯৫, খ. ১, ১ম ভাগ, পৃ. ৪৬০;

ইব্ন হাজার আসকালানী এর সংজ্ঞায় বলেন, السلم هو ان تعطى ذهبا او فضة في سلعة معلومة الى امد معلوم

দ্র. বুলুগুল মারাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০; "هو عبارة عن بيع الشئ على ان يكون دينا على البيع بالشرائط"

দ্র. বুখারী, ইমাম, *আস্‌সহীহ*, কিতাবুল বুয়ূ' বাবুস সালাম, পাদটীকা অংশ নং-১০, খ. ১, পৃ. ২৯৮; তিরমিযী, ইমাম, *জামি' আত্‌তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : মাজাআ ফিস সালাফ, পাদটীকা নং-১, পৃ. ২৪৫; "السلم هو بيع سلعة مؤجلة موصوفة في الذمة يعوض حال"

৯. প্রাগুক্ত

১০. "বায়' মুয়াজ্জাল বলতে বাকিতে বিক্রয় চুক্তি বুঝায় এবং বিনিয়োগের সাথে সাথে পণ্য/সামগ্রী গ্রাহককে সরবরাহ করা হয়। পক্ষান্তরে বায়' সালাম আগাম ক্রয় চুক্তি এবং বিনিয়োগের পর ভবিষ্যতের কোন নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য-সামগ্রী গ্রাহককে সরবরাহ করা হয়।" (দ্র. এম. এ হামিদ, অনুঃ ও সম্পাদনা, প্রফেসর শাহ মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি : একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*, পৃ. ১৫৩; এ.এ.এম হাবীবুর রহমান, ইসলামী ব্যাংকিং, ঢাকা: হক প্রিন্টার্স, ২০০৪, পৃ. ১৭৫)

১১. মোহন, ইকবাল কবীর, *আধুনিক ব্যাংকিং*, ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন, ২০০৩, পৃ. ১০৪

১২. Usmani, Taqi, *An Intruduction to Islamic Finance* Karachi: Idaratul Maarif, 1999), p. 146; Nicholas Dylan Ray, Ibid., p. 32; প্রফেসর শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, রাজশাহী: রাজশাহী স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, এপ্রিল, ২০০৫, পৃ. ৮১; এম. এ হামিদ, অনুঃ ও সম্পাদনা, প্রফেসর শাহ মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি : একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*, রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯, পৃ. ১৫৩

১৩. এ.এ.এম হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫; Board of Editors, *Test Book On Islamic Banking*, Dhaka : IERB, 2003, p. 135

১৪. আবদুর রকীব ও শেখ মোহম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং : তত্ত্ব, প্রয়োগ, পদ্ধতি*, ঢাকা : আল-আমিন প্রকাশন, ২০০৪, পৃ. ৬২

১৫. মারগিনানী, বুরহানউদ্দীন, *আল-হিদায়াহ*, দেওবন্দ: আশরাফী বুক ডিপো, ১৪০১ হি., খ. ২, পৃ. ৯১-৯২; সাবিক, আস-সায়্যিদ, *ফিকহুস সুন্নাহ*, বৈরুত: দারু কিতাবুল 'আরাবী, ১৯৮৭, খ.৩, পৃ. ১৫০

১৬. আল কুরআন, ২ : ২৮২

১৭. "قال ابن عباس رضى الله تعالى عنه اشهد ان السلف المضمون الى اجل قد احله الله في كتابه و اذن فيه هذه قراء هذه الاية"

দ্র. যুহাইলী, ড. ওহাবাহা, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, পাকিস্তান: মাকতাবাতুল হাক্কানিয়্যাহ, তা. বি., খ.৪, পৃ. ৫৯৭; মারগিনানী, বুরহানুদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ২, ১ম ভাগ, পৃ. ৯১

১৮. আল কুরআন, ২ : ২৭৫

১৯. কাশ্মিরী, মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ, *ফাইজুল বারী,* দিল্লী : রব্বানী বুক ডিপো, ১৯৮৮, খ.৩, কিতাবুস সালাম, পৃ. ২৬৯; আশরাফী, মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং কি কেন কিভাবে ?* ঢাকা: মাহিম পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮, পৃ. ১২৪

২০. "عن ابن عباس (رضى) قال قدم رسول الله (صلعم) المدينة و هم يسلفون بالثمر والسنتين و الثلث فقال رسول الله (صلعم) من اسلف ففي شئ فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم الى اجل معلوم" বুখারী, ইমাম, *আসসহীহ,* কিতাবুস সালাম, খ. ৪, হাদীস নং-২০৯৯, পৃ. ৯৮

২১. বুখারী, ইমাম, *আসসহীহ,* খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯

২২. আশরাফী, মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫; খান মাওঃ মোহাম্মদ ইসমাঈল, *ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ ও ব্যবসা,* ঢাকা: মীর পাবলিকেশন্স, ২০০১, পৃ. ৫১

২৩. মারগিনানী, বুরহানুদ্দীন, *প্রাগুক্ত,* ২ খ., ১ম ভাগ, পৃ. ৯২

২৪. সাবিক, আস-সায়্যিদ, *প্রাগুক্ত,* খ. ৩, পৃ. ১৫১

২৫. আশরাফী, মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান, *ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং-এর রূপরেখা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯২

২৬. আল কুরআন, ২ : ২৮২

২৭. সম্পাদনা পরিষদ, *ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃ. ৯১-৯২

২৮. বুখারী, ইমাম, *আসসহীহ,* প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২০৯৯, পৃ. ৯৮

২৯. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৯৮১, পৃ. ৩৭

৩০. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২০৩৪, পৃ. ৬১-৬২

৩১. আবূ দাউদ, ইমাম, *আসসুনান,* দেওবন্দ: দারুল কিতাব, তা, বি., হাদীস নং-৩৪৩২, পৃ. ৪০৩

৩২. বুখারী, ইমাম, *আসসহীহ,* প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২০৮৫, পৃ. ৮৮

৩৩. আবূ দাউদ, ইমাম, *আসসুনান,* প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৪৪৯, পৃ. ৪০৮

৩৪. হুসেইন, মুহাম্মদ মুবারক, *ইসলামী ব্যাংকিং : নীতিমালা ও প্রয়োগ,* ঢাকা:সপ্তপদী প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ. ৩২-৩৩; মান্নান, মোহাম্মদ আবদুল, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা,* ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ১৪৮

৩৫. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও রিএম হাবিবুর রহমান কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামী ব্যাংকে-এ শরীয়াহ্ পরিপালন প্রয়োগ পদ্ধতি,* ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ২০০৬, পৃ. ৭০

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ ৭, সংখ্যা ২৫
জানুয়ারি- মার্চ : ২০১১

আদর্শ সমাজ গঠনে নারীর মতামত ও অধিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

মোহাম্মদ মুরশেদুল হক*

[সারসংক্ষেপ ঃ মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। পুরুষ ও মহিলা এ শ্রেষ্ঠত্বের সমান অংশীদার। তারা একে অপরের পরিপূরক । মানবজাতির স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা পুরুষ-মহিলার পারস্পরিক সেতু বন্ধন ও সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। জীবনে চলার দুর্গম পথ-পরিক্রমায় পুরুষ ও মহিলা পরস্পর প্রেরণার উৎস। কুরআন মাজীদে মহিলা ও পুরুষকে একে অপরের অংশ এবং আচ্ছাদন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, দেয়া হয়েছে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্মান ও মর্যাদা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা একে অপরের মুখাপেক্ষী ও সম্পূরক। অথচ মানব রচিত বিভিন্ন মতবাদ, ইসলাম-পূর্ব প্রাচীন যুগ ও সভ্যতায় মহিলাদেরকে করা হয়েছে অবমূল্যায়ন, হরণ করা হয়েছে তাদের শিক্ষা-স্বাধিকার, মানবিক মূল্যবোধ ও ব্যক্তি সত্তাকে। চালানো হয়েছে তাদের উপর অমানবিক অত্যাচার, শোষণ ও নিপীড়ন। ইসলাম-পূর্ব যুগে নারীর আলাদা কোন মর্যাদা ছিল না, ছিল না সামাজিক ও অর্থনৈতিক কোন অধিকার। নারীদের অবস্থা শোচনীয়। কিন্তু মানবতার দূত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ স. আমাদের জন্য নিয়ে আসলেন শান্তির বিধান ইসলাম। নারী সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা হল- "আমি তোমাদের যুগলরূপে সৃষ্টি করেছি।" যেহেতু আল্লাহ পুরুষ ও নারীকে যুগলরূপে সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু ইসলামে নারী জাতিকে অবজ্ঞা করার জঘন্য অপরাধ। নবী স. এর ঘোষণা হল- "অধিকারের বেলায় পুরুষদের মতই নারীর অধিকার।" নারী। তাই অত্র প্রবন্ধে আদর্শ সমাজ গঠনে নারীর মতামতের মূল্যায়ন করাই মুখ্য বিষয়।]

ইসলাম-পূর্ব সমাজে নারীর স্থান ও মর্যাদা : ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে নারী কখনো কোন সমাজ ও সভ্যতায় তার যথাযোগ্য সামাজিক ও আইনগত মর্যাদা ও অধিকার লাভ করেনি। বিষয়বস্তু উপলব্ধির জন্য এ সম্পর্কিত কতিপয় বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো-

---

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

রোমান সমাজে নারী : সপ্তদশ শতাব্দীতে রোমে অনুষ্ঠিত Council of Wise এর সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় Woman has no Soul অর্থাৎ– নারীর কোন আত্মা নেই।[১] আর প্রাচীন রোমে নারীকে দাসী-বাঁদী (Slaves) হিসেবে বিবেচনা করা হতো। রোমান সমাজে মেয়ে সন্তানকে আজীবন পিতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অনুগত থাকতে হতো। অবশ্য পরিবার প্রধানের এই কর্তৃত্ব ৫৭৫ খ্রি. সম্রাট জাষ্টিনানের সময় খর্ব করা হয়।[২] বিবাহে নারীর মতামতের কোন তোয়াক্কা করা হতো না।[৩]। স্বামীর মৃত্যুর পর তার পুত্র বা দেবর-ভাসুরদের তার উপর আইনানুগ অধিকার জন্মাত।[৪]

গ্রীক সভ্যতায় নারী : প্রাচীন গ্রীক সমাজে নারীর কোন মর্যাদা ছিল না। যদিও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষায় তারা চরম উৎকর্ষ সাধন করেছিল, তথাপিও নারী প্রজন্মকে তারা মানবতার জন্য একটা দূর্বিষহ বোঝা মনে করতো। নারীদেরকে শয়তানী কর্মের সহায়ক বলে মনে করা হতো।[৫] তাদের ধারণায়-অগ্নিদগ্ধ হবার ও সর্প দংশনের প্রতিকার সম্ভব কিন্তু নারীর কু-প্রভাব ও অকল্যাণের প্রতিকার সম্ভব নয়।[৬] গ্রীক কবি Chaeremon বলেন, একজন নারীকে বিবাহ করার চেয়ে তাকে কবর দেয়া অনেক শ্রেয়।[৭] গ্রীক দার্শনিক প্লেটো নারী স্বাধীনতা ও নারী পুরুষের সমমর্যাদার দাবিদার ছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু আধুনিক কালের গবেষকদের বিবেচনায় তা ছিল নিছক মৌখিক ও তাত্ত্বিক শিক্ষার নামান্তর।[৮]

ভারতীয় সভ্যতায় নারী : জাহিলী যুগে ভারতীয় উপমহাদেশেও নারী জাতির অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। বৈদিক যুগে কোন বিষয়ে নারীর অধিকার থাকলেও সাধারণত তারা পুরুষের কৃপার পাত্রী রূপেই পরিগণিত হতে। সে যুগের নারীর অবস্থা সম্পর্কে চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বলেন, "বৈদিক যুগে বহু যুবতীর বিবাহ হত না, তারা কুমারী অবস্থাতেই পিতৃগৃহে থাকত। বিকলাঙ্গ কন্যাদের বিবাহ হত না। বিবাহ হয়ে গেলে কন্যার পৈর্তৃক সম্পত্তিতে আর অধিকার থাকত না। এ জন্য কন্যার ভ্রাতারা ভগ্নির বিবাহ দিতে চেষ্টিত থাকত- বিধবারা প্রায়ই স্বামীর ভ্রাতাকে বিবাহ করত। এ জন্য স্বামীর ভ্রাতার নাম হয়েছিল দেবর বা দ্বিতীয় বর। বিধবা হলে পত্নী পতির চিতায় শয়ন করে দেবরের আহবানে উঠে আসত ও পতির শবদাহ করতো।[৯] হিন্দু শাস্ত্রে বলা হয়েছে- তকদীর, তুফান, মৃত্যু, নরক এবং বিষাক্ত সাপ এগুলোর একটিও এত নিকৃষ্ট নয় যেরূপ নিকৃষ্ট নারী।[১০]

চীনা সভ্যতায় নারী : চীন দেশে নারীদের মর্যাদা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। চীন সমাজের প্রাচীন শিলালিপিতে নারীকে দুঃখের পানি বলা হয়েছে, যা পুরুষের সকল সৌভাগ্যকেই ধুয়ে ফেলে।[১১] নারী কখনো কোন সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত না। এমনকি সন্তানের উপরও তার কোন অধিকার থাকত না। স্বামী

যখন ইচ্ছা, তখন স্ত্রীকে তালাক দিতে পারত। এমনকি স্ত্রীকে বিক্রয় করা যেত এবং বিধবা হয়ে গেলে পুনঃবিবাহ তার জন্য প্রায় অসম্ভব ছিল।[১২]

ইয়াহুদী ধর্মে নারী : ইয়াহুদী ধর্মে নারীকে ভাবা হয় পুরুষদের প্রতারক হিসেবে। নারীকেই সকল পাপের উৎস বলে তারা মনে করতো। কারণ প্রথম নারী 'হাওয়া' এর পাপের দরুন স্বর্গ থেকে আদমের অধঃপতন (নাউযু বিল্লাহ্)। এ প্রসঙ্গে মার্টিন লুথার মনে করেন, ঈশ্বর নারীকে দুই ভাগে সৃষ্টি করেছেন। (ক) এক ভাগ স্ত্রী হিসেবে আর (খ) অন্যভাগ প্রেমিকা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।[১৩]

ইয়াহুদী সমাজে নারীরা তাদের সর্বপ্রকার মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে যুলুম ও শোষণের যাতাকলে নিষ্পেষিত ছিল। জ্ঞান চর্চার কোন সুযোগ তারা কল্পনাও করতে পারতো না। ইয়াহুদীদের এ সব কার্যক্রম যে মনগড়া মানব রচিত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কোন আসমানী ধর্ম নারীদের সাথে এরূপ জঘন্য আচরণের নির্দেশ দিতে পারে না। মূসা আ.-এর জীবনে নারীর প্রতি দয়া প্রদর্শনের বহু উদাহারণ রয়েছে। মাদায়েন যাত্রাকালে কূয়ার পাশে অপেক্ষমান দুই বালিকাকে নিজে সাহায্য করেছিলেন, যা আল কুরআনে বিবৃত হয়েছে। অথচ তারই উম্মতের দাবিদার ইয়াহুদীদের ইতিহাস নারী অধিকার হরণ ও নারী কেলেংকারীতে পরিপূর্ণ।[১৪]

খ্রিস্ট ধর্মে নারী : জনৈক খ্রিস্টান পাদ্রীর মতে, নারী শয়তানের প্রবেশস্থল। তারা প্রভুর মান-মর্যাদার প্রতিবন্ধক। প্রভুর প্রতিরূপ মানুষের পক্ষে তারা বিপজ্জনক। তারা মনে করে, হাওয়া আ. এর ভুলের কারণে নারী রক্তে পাপের সঞ্চালন ঘটেছে। তারা দু'টি কারণেই নারীদের প্রতি ক্রোধান্বিত-

(ক) মা হাওয়া আ. (নারী) এর কারণেই আদম আ. কে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে জান্নাত থেকে বের হয়ে আসতে হয়েছে।

(খ) নারীর পাপের প্রায়শ্চিত্বের জন্যই ঈসা আ. এর মত একজন শুদ্ধ মানবের শূল বরণ করতে হয়েছে। এ সব কারণেই নারীদের প্রতি তাদের এত অবজ্ঞা-অত্যাচার।[১৫]

এমনকি ১৮০৫ খ্রি. পর্যন্ত ইংরেজদের দেশে আইনগতভাবে পুরুষ তার স্ত্রীকে বিক্রয় করতে পারতো। অনেক ক্ষেত্রে একজন স্ত্রীর মূল্য ধরা হতো অর্ধ শিলিং। এক ইটালীয় স্বামী তার স্ত্রীকে কিস্তি হিসেবে আদায়যোগ্য মূলে বিক্রয় করেছিল। পরে ক্রেতা কিস্তি পরিশোধে অস্বীকার করলে বিক্রয়কারী তাকে হত্যা করে।[১৬]

বৌদ্ধ ধর্মে নারী : তাদের মতে, নারী হচ্ছে মোহের বাস্তব স্বরূপ এবং মানবাত্মার নির্বাণ লাভের সবচেয়ে বড় বাঁধা। সুতরাং নারীকে বিসর্জন দিয়ে নির্জন পাহাড় পর্বতে ধ্যানমগ্ন হওয়াই মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়। তাদের মতে, নারী হল সকল

অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ। তাই তো ঐতিহাসিক ওয়েস্টারমার্ক বলেন, মানুষের জন্য প্রলোভন যতগুলো ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক।[১৭]

মহানবী স. এর আবির্ভাব-পূর্ব আরব সমাজে নারী : মহানবী স. এর আগমনের পূর্বে আরব জাহানে নারীর মর্যাদা বলতে কিছুই ছিল না।

আরব জাহিলী সমাজে কন্যা সন্তানের সাথে কি নির্দয়-নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হতো তার একটি ঘটনা নবী করীম স. এর একজন সাহাবী তাঁর নিকট বর্ণনা করেন। সাহাবী বলেন, আমার একটি কন্যা সন্তান ছিল। সে আমাকে খুবই ভালবাসত। তাকে ডাক দিলে সে দৌড়ে আমার কাছে আসতো। একদিন আমি তাকে ডেকে আমার সঙ্গে নিয়ে গেলাম। পথিমধ্যে একটি কূপ পেয়ে হাত ধরে তাকে ধাক্কা দিয়ে কূপে ফেলে দিলাম। তার শেষ যে কথাটি আমার কানে ভেসে এসেছিল তা ছিল হায় আব্বা, হায় আব্বা। এই বিবরণ শুনে নবী করীম স. এর দুই চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। উপস্থিত এক ব্যক্তি বলল, ওহে! তুমি নবী স. কে শোকাভিভূত করেছো। তিনি বললেন, থামো। যে বিষয়ে তার কঠিন অনুভূতি জেগেছে সেই সম্পর্কে তাকে বলতে দাও, তাকে বাধা দিও না। তিনি তাকে বললেন, তোমার ঘটনাটি আবার বর্ণনা কর। সাহাবী তাকে পুরো ঘটনাটি পুনরায় শুনালেন। এবার তিনি এতো কাঁদলেন যে, চোখের পানিতে তাঁর দাঁড়ি ভিজে গেলো। অবশেষে তিনি বললেন, জাহিলী যুগে যা কিছু করা হয়েছে তা আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন নতুন করে জীবন শুরু করো।[১৮]

উমর রা. বলেন, আল্লাহর শপথ! জাহিলী যুগে আমরা নারীদের কোন গুরুত্বই দিতাম না। পরে আল্লাহ তাআলা যখন তাদের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল করলেন এবং তাদেরকে মৃত আত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস বানালেন, তখন আমাদের ধারণার পরিবর্তন হলো।[১৯]

সমাজে নারীর অধিকার ও মতামত প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা : মতামত প্রকাশ এবং অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করেনি। যদিও পাশ্চাত্যবাদীরা ইসলাম প্রদত্ত নারীর অধিকার ও মতামত সম্পর্কিত বিষয়ে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, তথাপি এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মৌলিক বিচারে ইসলামই একমাত্র জীবন-ব্যবস্থা যেখানে নারীকে তার যথার্থ অধিকার প্রদান পূর্বক স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। আশা করা যায় নিম্নের আলোচনায় তার যথার্থ প্রমাণ মিলবে। যেমন-

দাম্পত্য জীবনে নারীর মতামতের গুরুত্ব : দাম্পত্য জীবনে নারীর মতামতের গুরুত্ব অপরিসীম। একজন পুরুষ যেমন শরীআতের সীমারেখার ভিতরে থেকে- দীনি-দুনিয়াবী ব্যাপারে মুক্ত ও স্বাধীন, তেমনি একজন প্রাপ্ত বয়স্ক নারীও স্বাধীন। যেমন-

এক : একজন নারী শরীয়তের সীমারেখার ভিতরে থেকে আপন মর্জি মুতাবিক একজন পুরুষের নিকট বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

প্রমাণ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে : নবী স. বলেন, স্বামীহীনা, বালেগা মহিলা তার অভিভাবক অপেক্ষা বেশী হকদার আপন সত্তার ব্যাপারে।[২০]

দুই : একজন জ্ঞান সম্পন্ন বালেগা মহিলাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক কোন ব্যক্তিই কারো নিকট বিয়ে দিতে পারবে না।

প্রমাণ : নবী স. বলেন 'আক্বেলা, বালেগা, ইয়াতীম মহিলার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। অনুমতি চাওয়ার পর যদি সে নিশ্চুপ থাকে, তাহলে এটাকেই ধরা হবে তার অনুমতি। আর যদি সে অস্বীকার করে বসে, তাহলে তার সে বিয়ে বৈধ হবে না।[২১]

তিন : কারো অধিকার নেই জ্ঞান-সম্পন্ন বালেগা মহিলার পছন্দ-অপছন্দকে প্রত্যাখ্যান করার এবং নিজ খেয়াল খুশী মত উক্ত পাত্রীর বিয়েতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার ।

প্রমাণ : মাকিল রা. বলেন, আমি আমার এক বোনকে এক ব্যক্তির নিকট বিয়ে দিয়েছিলাম। কিছু দিন পর সে অকে তালাক দিয়ে দেয়। তার যখন ইদ্দত পালনের সময় শেষ হয়ে যায়, তখন সে ব্যক্তি তাকে বিয়ে করার জন্য পুনরায় প্রস্তাব নিয়ে আসে। ফলে আমি তাকে বললামঃ আমি (আমার বোনকে) তোমার নিকট আর বিয়ে দেব না। পক্ষান্তরে আমার বোন এ বিয়েতে সম্মত ছিল। এ ঘটনার পরেই আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন। " মেয়েদের নিষেধ করো না তাদের স্বামীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে"। পরবর্তীতে তিনি উক্ত বিয়ে সম্পন্ন করেন।[২২]

চার : কেউ যদি মহিলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো কাছে তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়, তাহলে সেই মহিলা সে বিয়ে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখে।

প্রমাণ : খানসা বিনতে হিযাম রা. বলেন, তার পিতা তাকে এরূপ এক ব্যক্তির নিকট বিয়ে দিয়েছিলেন, যার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে তিনি সম্মত ছিলেন না। ফলে বাধ্য হয়ে তিনি নবী স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে পুরো ঘটনাটি অবহিত করলেন এবং নবী স. তার পিতা কর্তৃক সংঘটিত বিয়ে বাতিল করে দেন।[২৩]

পাঁচ : বিয়ের পর যদি দাম্পত্য জীবন একেবারেই সুখকর না হয় এবং কোনক্রমেই বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভবপর না হয়, তাহলে একজন মহিলাও পারে "খোলা' "তালাক প্রদান করে ইসলামী 'আদালতের শরণাপন্ন হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে।

প্রমাণ : যদি স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে ভীষণ জটিলতা দেখা দেয়, যার ফলে একত্রে জীবন-যাপনের কোন পথই খোলা না থাকে, তাহলে স্বামী তালাক দিতে পারে- এমনিভাবে স্ত্রী ও খোলা' অথবা ইসলামী আদালত/ কাযীর মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। এ সম্পর্কে কুরআনে তালাক সম্পর্কিত আয়াত এবং হাদীসে তালাক সম্পর্কিত অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।[২৪]

এ সব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায়, ইসলাম নারীকে পারিবারিক জীবনে কতটুকু স্বাধীনতা দান করেছে। আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স. এর নিকট বললেন- কুমারী মেয়েরা বিবাহের সম্মতি মুখে প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করে। নবী স. বললেন, চুপ থাকাটাই তাদের সম্মতি বলে গণ্য হবে। নবী স. এর বাণী দিয়েই নিম্নোক্তভাবে অভিমত পেশ করা যায় যে, আবূ হুরায়রা রা. বর্ণনা করলেন, নবী স. বলেন, একবার বিয়ে হয়েছে এরূপ নারীদেরকে (দ্বিতীয়বার) বিবাহদানে তার স্পষ্ট অনুমতি গ্রহণ করতে হবে এবং কুমারীকে বিবাহদানে তার সম্মতি নিতে হবে। অপর বর্ণনায় এসেছে যে, আয়িশা রা. কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি নবী স. এর নিকট বললেন, কুমারী মেয়ে বিবাহের সম্মতি মুখে প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করে। নবী স বললেন, চুপ থাকাটাই তার সম্মতি বলে গণ্য হবে।

(খ) আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠায় নারীর মতামতের গুরুত্ব : নারীদের নিকট হতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরামর্শ , প্রস্তাব, মতামত ও ইসলামী সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে ফাতওয়া গ্রহণের যে বিধান রয়েছে, কুরআন ও সুন্নাহ'র আলোকেই নিম্নে তার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো-

এক : আল্লাহ তাআলার বাণী- "তাদের একজন বলল, পিতা তুমি একে মজুর নিযুক্ত কর। কেননা তোমার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত"।[২৫]

অর্থাৎ শোয়াইব আ. এর কন্যা পিতাকে পরামর্শ দিলেন এবং প্রস্তাব পেশ করলেন যেন মূসা আ. কে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়। কারণ তিনি বিশ্বস্ত। শোয়াইব আ. স্বীয় কন্যার প্রস্তাবের যথার্থতা উপলব্ধি করেন এবং সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে শর্ত সাপেক্ষে মূসা আ. কে চাকুরীতে নিয়োগ দান করেন।

দুই : আমীরে মুআবিয়া ও আলী রা. এর মাঝে চলমান দ্বন্দ্ব নির্মূল করার লক্ষ্যে এক সালিসী বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. কেও দাওয়াত দেয়া হয়। তিনি বৈঠকে যাবেন কি না ইতস্ততবোধ করলেন। তাই স্বীয় বোন হাফসা রা. এর সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি বললেন, শীঘ্রই চলে যাও। তোমার অনুপস্থিতিতে হয়ত মুসলমানদের মাঝে অনৈক্যের সৃষ্টি হতে পারে।[২৬]

তিন : নবী স. ৬২৮ খ্রি. হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার পর যখন সাহাবাদেরকে নির্দেশ দিলেন- কুরবানী করতে, মাথার চুল কেটে ফেলতে, তখন একজন সাহাবীও স্বীয় স্থান হতে উঠলেন না। নবী স. এ কথাটি তিনবার উচ্চারণ করার পর উম্মে সালামা রা. এর তাবুঁতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তাঁকে পরামর্শ দিলেন এবং প্রস্তাব পেশ করেন যেন তিনি বাইরে গিয়ে কারো সাথে কোন কথা না বলে কুরবানীর পশু যবেহ করেন এবং মাথার চুল কেটে ফেলেন। নবী স. তাঁর এ পরামর্শ কার্যকর করার পর সাহাবা কিরাম কুরবানীর পশু যবেহ করেন এবং একে অপরের মাথার চুল ছেটে ফেলেন।[৩৩]

চার : আয়িশা রা. প্রায় প্রতি বছরই হজ্জব্রত পালন করতেন। হজ্জের মৌসুমে তাঁর তাঁবুর কাছে দেশ-বিদেশের অসংখ্য মানুষের ভীড় জমতো। কখনো কাবা গৃহের প্রশস্ত অঙ্গনে বা কখনো যমযমের ছাদের নীচে উপবেশন করে তিনি জনগণের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতেন, পরামর্শ দিতেন, সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখতেন এবং সিদ্ধান্ত জানাতেন।[২৯]

পাঁচ : ইমাম আবূ হানীফা র. এর মতে, মহিলাগণ ফৌজদারী মোকদ্দমা ছাড়া অন্যান্য মোকাদ্দমায় 'আদালতের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন।[২৯]

তাই আদর্শ পরিবার গঠনে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই ভূমিকার ব্যাপারে কিয়ামতের দিনে নারীকে জবাবদিহি করতে হবে। নবী স. বলেন নারী তার স্বামীর পরিবারবর্গ এবং সন্তান-সন্ততির তত্ত্বাবধায়ক, তাদের হক কতটুকু আদায় করা হয়েছে, কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে"।[৩০]

নারীকে ইসলাম সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে। মাতারূপে নারীকে ইসলাম যে উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছে দুনিয়ার অপর কোন সম্মানের সাথেই তার তুলনা হতে পারে না।

শরীআত যেহেতু সমাজে নারীর ভূমিকাকে গৌন করেনি এবং তাকে নির্লিপ্ত জীবন অবলম্বনের কথাও বলেনি, বরং কুরআন ও সুন্নাহয় নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। নারীরা স্বীয় মতামত প্রকাশ করবে, কোন মতকে গ্রহণ বা বর্জনের ঘোষণা দিতে পারবে এবং সরকার যদি সমাজে বিরাজমান সমস্যা নিরসনে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারাও সরকারের সমালোচনা করতে পারবে। এছাড়াও আল্লাহ

তাআলা নারী ও পুরুষ উভয়ের কাছেই সমানভাবে যে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন তা বাস্তবায়নেও নারীকে অধিকার দিতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর মুমিন নর-নারী একে অপরের পৃষ্ঠপোষক। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজে নিষেধ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ আআলা ও তাঁর রসূল স. এর আনুগত্য করে, আল্লাহ তাআলা এদেরকেই দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়"।[৩১]

(গ) আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠায় নারীর অবদান : ইসলাম জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরকেও নির্ধারিত অধিকার ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে। ইসলাম প্রদত্ত অধিকারগুলো হচ্ছে–

এক : ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে মক্কায় যেসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাদের মাঝে আম্মার ইবনে ইয়াছির রা. এর পরিবার অন্যতম। তাঁর মা আবূ হুযায়ফা ইবনে মুগিরার গৃহভৃত্য ছিলেন। ইসলাম থেকে বিমুখ করার উদ্দেশ্যে আম্মারের মা এর উপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। এমনকি ইসলাম গ্রহণের অপরাধে আবূ জাহেল বর্শার প্রচন্ড আক্রমণে তাকে শহীদ করে ফেলে। প্রাণ বিসর্জন দিলেও তিনি ইসলাম ত্যাগ করেননি।

তাবাকাত আল কুবরা গ্রন্থকার বলেন, এটা ইসলামের ইতিহাসে প্রথম শাহাদত-যা নবী সা. এর ডাকে সাড়া দেয়ার প্রেক্ষিতে নসীব হলো।[৩২]

দুই : উমর রা. এর বোন ফাতেমা রা. ইসলাম গ্রহণ করলে উমর রা. তাকে এমনভাবে প্রহার করেন যার ফলে তাঁর পুরো শরীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও ফাতেমা রা. ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলেন না। বরং তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় উমরের জবাবে বলেন, হে খাত্তাবের পুত্র, আমি ঈমান এনেছি, তুমি যা ইচ্ছে তা করতে পারো।

তিন : উম্মে আম্মারা রা. উহুদের যুদ্ধে দৃঢ়তা ও সাহসিকতার যে পরিচয় দিয়েছেন ইতিহাসে তা চিরকাল ভাস্বর হয়ে থাকবে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে কাফির নবী স. কে অস্ত্রশস্ত্রসহ ঘেরাও করে ফেললে উম্মে আম্মারা নাঙ্গা তরবারী হাতে সিংহের ন্যায় শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে সামনে এগিয়ে যান। শত্রুর তরবারী থেকে নবী স. কে রক্ষা করার জন্য বীর দর্পে অস্ত্র চালনা করেন। রণক্ষেত্রে তাঁর বীরত্বপূর্ণ সাহসিকতার পরিচয় দিতে গিয়ে স্বয়ং নবী স. বলেন, ডানে বামে যে দিকে তাকিয়েছি উম্মে আম্মারাকে আমি আমার চারপার্শ্বে যুদ্ধ করতে দেখেছি।[৩৩]

চার : ইকরামা ইবনে আবু জাহলের স্ত্রী উম্মে হাকীম রা. মুসলমানদের পক্ষে রোমান সৈন্যদের বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন। তাঁর স্বামী ইকরামা রা. এক যুদ্ধে শহীদ হবার কিছু দিন পর 'মারজে সফর' নামক এক এলাকায় খালিদ ইবন সাঈদের রা. সাথে তার বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ের পরের দিন খালিদ রা. ভোজের আয়োজন করেন। আপ্যায়ন তখনো শেষ হয়নি, খবর এলো রোমান সৈন্যরা মুসলমানদের উপর ঝাপিঁয়ে পড়ছে। তীব্র লড়াইয়ের এক পর্যায়ে যোদ্ধা উম্মে হাকীম রা. আপন তাঁবুর একটি খুঁটি নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে এগিয়ে যান এবং পর পর সাতজন শত্রু সেনাকে পিটিয়ে হত্যা করেন।[৩৪]

একজন মহিলা সাহাবী বলেন, আমরা নবী স. এর সাথে যুদ্ধে যেতাম, মুজাহিদদের পানি পান করাতাম, তাদের সেবা করতাম, যুদ্ধে নিহত ও আহত ব্যক্তিদের আমরা মদীনায় পৌছাতাম।[৩৫] আমরা আহতদের ব্যান্ডেজ করতাম এবং অসুস্থদের চিকিৎসা ও সেবা করতাম।[৩৬]

ইবনে আবদুল বার বলেন, নবী স. এর ফুফু আরওয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব ঈমান আনার পর নবী স. এর সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং আপন সন্তানকে নবী স. এর সহায়তা এবং লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন।

আবদুল্লাহ ইবনে যায়িদ রা. ওহুদের যুদ্ধে আহত হয়ে পড়লে তার মা উম্মে আম্মারা (রা.) আহত স্থানে ব্যান্ডেজ করে দেন। অতঃপর তিনি নির্দেশ দেন" হে পুত্র আমার! উঠ, তরবারী নিয়ে মুশরিদের উপর ঝাপিঁয়ে পড়ো।'[৩৭]

ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় নারীদের অংশগ্রহণ

ইমাম খোমেনী প্যারিসে থাকাকালে একদিন এক সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন- ইসলামী শরীআতের বিধান মুতাবিক ইসলামী সরকারে নারী কতটা অংশীদারিত্বের সুযোগ পেতে পারে? জবাবে তিনি বলেন, ইসলামী শরীয়তে সমাজ বিনির্মাণের কাজে নারীদের উপর ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। এ ধর্ম নারীর মানবিক মর্যাদার উত্তরণে বিরাট অবদান রেখেছে ও নারীকে গতানুগতিক বস্তুগত লক্ষ্যের আবর্তে ঘুরপাক খাওয়া থেকে উদ্ধার করেছে।

নবী স. এর যুগে তাঁর দীন প্রচার ও প্রসারে, মুশরিকদের বিরোধিতা, যুলুম নিপীড়ন সহ্য করা এবং স্বীয় আদর্শ-অস্তিত্বের প্রয়োজনে মুসলমানদের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদিসহ সকল প্রকার সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকান্ডের কোনটিতেই মহিলারা অনুপস্থিত ছিলেন না বা তাঁরা নতুন আদর্শে দীক্ষিত হওয়া বা ইসলাম ধর্ম

গ্রহণ করার ব্যাপারে পিছিয়ে পড়েননি। বরং সর্বত্রই তাঁদের একটি ইতিবাচক ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। যেমন খাদীজা রা. প্রথম ঈমান গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম।

ঈমান ও ধর্মের সংরক্ষণে নারীরা অত্যাচার-নিপীড়ন সহ্য করেছিলেন, একই লক্ষ্যে হিজরতও, জিহাদে শামিল হয়েছিলেন, এমনকি প্রয়োজনে প্রত্যক্ষ যুদ্ধেও লিপ্ত হয়েছিলেন। যেমন ইসলামের প্রথম শহীদ সুমাইয়া রা.।

অতএব, এটা অনস্বীকার্য যে, ইসলামী সমাজব্যবস্থার আওতায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশ গ্রহণ বৈধ। তবে প্রসিদ্ধ উলামায়ে কিরামের মতে, মুসলিম নারীরা সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হলে নারী হিসেবে তার পরিবারের প্রতি এবং সন্তানদেরকে লালন-পালনের যে দায়িত্ব রয়েছে তা যথাযথ পালন করতে সক্ষম হবে না। তাই নারীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ না করা উচিত। কারো কারো মতে, ভোট দিতে পারবে, নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না। আবার কারো মতে, একজন নারী সংসদ সদস্য হতে পারবেন কিন্তু মন্ত্রী, প্রশাসক, ব্যবস্থাপক বা প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না। তাদের মাঝে আবার অনেক আলিম এই মতও পোষণ করেন যে নারী প্রেসিডেন্ট পদ ছাড়া সকল পদেই কাজ করতে পারবে। তাঁরা তাঁদের রায়ের স্বপক্ষে দলিল হিসেবে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করেন-

"পুরুষ হচ্ছে নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাআলা তাদের একজনকে অপরের উপর প্রাধান্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে।"[৩৮]

অত্র আয়াতে আমরা আরবী 'কাউওয়ামূন' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে 'কর্তা' অর্থটি গ্রহণ করতে চাই, তবে শব্দটির ভিন্ন অর্থ বিবেচ্য। কোন কোন ভাষাতত্ত্ববিদের মতে, শ্রেষ্ঠতর কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করা হলে তা কুরআনের সূরা হুজুরাতের ১৩ নম্বর আয়াতের পরিপন্থী হয়ে যায়, যেখানে বলা হয়েছে যে, শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে তাকওয়ার উপর। "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার কাছে সে-ই সর্বাধিক মর্যদাবান যে মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ, সব কিছুর খবর রাখেন"।[৩৯]

আলোচ্য শব্দের অন্যান্য অর্থ হল- সংরক্ষণ করা, আনুকূল্য প্রদান ইত্যাদি। এই ব্যাপারে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ফিকহশাস্ত্রের আলোচনায় এরূপ অর্থ কেবল নারীর উপর বর্তায় না, নারী-পুরুষ উভয়ের উপরেই বর্তায়। এ যুক্তি থেকে

এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, উল্লেখ্য আয়াত কেবল পারিবারিক বিষয়ে কর্তৃত্বের ব্যাপারে প্রযোজ্য, অন্যান্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়।

পুরুষের কর্তৃত্ব প্রসঙ্গটি পরিবারে তার দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত এবং সেটা তার সামর্থ্য সংশ্লিষ্ট। এ কর্তৃত্ব পুরুষকে সকল অবস্থানে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে না।

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন, "তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী, আর নারীদের উপর পুরুষদের প্রাধান্য রয়েছে, আর আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"।[৪০]

অত্র আয়াতে নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্য (দারাজাহ্) অর্থ কর্তৃত্ব আরোপ নয়। এতে আপাতদৃষ্টিতে নারীর কর্তৃত্বকে খর্ব করা হয়েছে বলে মনে হলেও অতি সরলীকৃত অর্থে এই আয়াতের মর্ম অনুধাবন করা যাবে না। এতে (দারাজাহ্) শব্দটি পুরুষকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব প্রদানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এটাকে সকল ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব হিসেবে গণ্য করার মত সরল অর্থ করা সংগত নয়। বস্তুতঃ এই কর্তৃত্ব প্রসঙ্গ নিছক পুরুষ এবং নারীর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্যে সীমিত। অধিকাংশ ফকীহ্ এ আয়াতটি পারিবারিক প্রসঙ্গে প্রযোজ্য বলে মনে করেন।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, "আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং জাহিলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না"।[৪১]

অত্র আয়াত কেবল নবী স. এর পবিত্র স্ত্রীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিশেষ কারণে তাদেরকে ঘরের বাইরে যেতে বারণ করা হয়েছে, ফলে তাঁদের পক্ষে শাসন কর্তৃত্বশীল কাজে সম্পৃক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না।

ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক মর্যাদা

ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার বলতে সর্বপ্রকার ধন-সম্পত্তিতে তার মালিকানার অধিকার এবং তার ইচ্ছামত ঐ সব ধন-সম্পদ ব্যয় বা ব্যবহার করার পূর্ণ স্বাধীনতাকে বুঝায়।

১. উত্তরাধিকার : আল্লাহ্ তাআলা সম্পত্তিতে নারীর অধিকার প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে কুরআনের ভাষ্য হলো, "পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে। তা অল্পই হোক বা বেশীই হোক, এক নির্ধারিত অংশ"।[৪২]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন, "তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের (স্ত্রী) জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের (স্ত্রী) জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ"।[৪৩]

এতে প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষের মতো নারীরাও উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদের মালিক হবেন। তা একমাত্র ইসলামেরই অবদান।

২. মোহরানার অধিকার : এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হলো, "আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে"।[৪৪]

এ ছাড়া সূরা নিসার ২৪ ও ২৫ নং আয়াতেও দেনমোহর প্রদানের আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং মোহর প্রদান করা ফরয।

৩. ভরণ-পোষণ : স্ত্রীর তার স্বামীর নিকট হতে জীবনযাপনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপকরণ পাবেন। অর্থাৎ স্ত্রীর সকল ব্যয় স্বামীকে বহন করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "এবং জনকের কর্তব্য যথারীতি তাদের (স্ত্রী ও সন্তান) ভরণ-পোষণ করা"।[৪৫]

ইসলাম এও বলেছে যে, স্ত্রী যদি সামর্থ্যবান হয় এমনকি অঢেল ধন-রত্নের মালিক হোন না কেন তথাপিও স্বামী তার ভরণ-পোষণে বাধ্য।

৪. ব্যক্তিগত সম্পদের মালিক : নারীরা ব্যক্তিগত সম্পদের অধিকারী হতে পারবে ব্যবসার মাধ্যমে অথবা নিজ পরিশ্রমের মাধ্যমে অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে, তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে শালীনতা ও পর্দার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

আদর্শ পরিবারের সদস্য হিসেবে নারী

ইসলাম নারীকে পারিবারিক সদস্য তথা মাতা, কন্যা ও স্ত্রী হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় তাদের অধিকার-মর্যাদা-মতামত প্রদানে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

১. মানুষ হিসেবে নারী : আল্লাহ তাআলা একজন পুরুষ ও একজন নারীর মাধ্যমেই মানব জাতির গোড়াপত্তন করেছেন এবং আজো মানব জাতির সৃষ্টি অব্যাহত রেখেছেন। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন নর ও একজন নারী থেকে"।[৪৬]

তিনি আরও বলেন, "এবং তিনি সেই দুই নারী-পুরুষ থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন"।[৪৭]

অতএব মানব সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসেবে ইসলাম ধর্মে নারী-পুরুষ উভয়ের গুরুত্ব সমান।

২. কন্যা হিসেবে নারী : নবী স. ঘোষণা করলেন, "যার প্রথম সন্তান কন্যা তিনি ভাগ্যবান। শুধু তাই নয় তিনি কন্যা শিশুদের খুবই ভালবাসতেন। আবূ কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. এর কন্যা যয়নবের স্বামী ছিলেন ইবনে রাবি'আ। তাদের মেয়ে উসামাকে কোলে নিয়ে নবী স. নামায আদায় করতেন। যখন তিনি

সিজদা করতেন, তাকে নীচে রেখে দিতেন, আবার যখন দাঁড়াতেন তাকে কোলে তুলে নিতেন।[৪৮]

নবী স. আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তির একটি কন্যা সন্তান বা বোন রয়েছে এবং সে তাকে জীবন্ত কবর দেয়নি, অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্যতার ভাব দেখায়নি এবং পুত্র সন্তানকে তার কন্যা সন্তানের উপর প্রাধান্য দেয়নি, সে ব্যক্তি জান্নাতী"।[৪৯]

৩. স্ত্রী হিসেবে নারী : বিবাহের পর নারীরা যেমন বহুবিধ অধিকার, মতামত প্রকাশ ও মর্যাদা পেয়ে থাকে তেমনি ইসলামী জীবন আদর্শ দ্বারা উজ্জীবিত দম্পতি অনাবিল শান্তিময় জীবন লাভ করে। বিবাহোত্তর জীবনে নারীর সর্বোত্তম প্রাপ্তি স্বামীর ভালবাসা এবং তাকে ও তার পরিবারকে (স্বামীর) দেখাশুনার গুরু দায়িত্ব দেয়ায় নারীর ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। স্ত্রী হিসেবে নারীকে সম্মান দিতে যেয়ে নবী স. বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রী-পরিজনের কাছে উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রী-পরিজনের কাছে উত্তম"।[৫০]

৪. মা হিসেবে নারী : নারীর সর্বশেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান হলো 'মা'। ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়ায় এই মায়ের স্থান অনেক উপরে। যে মা সন্তানকে পেটে ধারণ করেন সেই মায়ের হক যে কত বড় তা বলার অবকাশ রাখে না। কুরআনে বিষয়টি এভাবে বলেছেন, "জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে"।[৫১]

আরও বলেন, "তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে উফ্ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলো"। তাই তো তাদের জন্যে দু'আ করতে আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন, "হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর, যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছেন"।[৫২]

মায়ের সম্মানের কথা বুঝাতে গিয়ে মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশত বলে নবী স. ঘোষণা করেছেন। মায়ের হক সম্পর্কে আবূ হুরায়রা রা. এর প্রশ্নের জবাবে নবী স. মায়ের হক তিনটি এবং পিতার হক একটি বলে জানান। এভাবে অসংখ্য কুরআনের আয়াত রয়েছে।

পর্যালোচনা : কুরআনের বহু আয়াতে নারী-পুরুষ উভয়ের কথাই আলোচিত হয়েছে। কুরআনের বহু আয়াতে নারীদের অধিকার প্রসঙ্গে কথা রয়েছে। এগুলোকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করা যায়। এ সব অধিকার সম্পর্কে কুরআনে বলিষ্ঠভাবে আল্লাহর বাণী উচ্চারিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল-সম্মান ও মর্যাদার বিচারে নারী জাতি কি সে স্থানে উপনীত হবার যোগ্যতা রাখে যে স্থানে একজন পুরুষ পৌছঁতে পারে, নাকি প্রকৃতিগত ভাবেই নারীরা পুরুষের চেয়ে দুর্বল? প্রশ্নটির উত্তর বের করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

পুরুষকে যেমন সৌন্দর্য দেয়া হয়েছে তেমনি তা নারীকেও দেয়া হয়েছে। পুরুষদের যেমন অন্যান্য সৃষ্টির উপর বিজয়ী হবার ক্ষমতা রয়েছে তেমনি সে ক্ষমতা নারীদেরও রয়েছে।

আমাদের অবশ্য এ কথা জানা আছে যে, নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীতেই বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, একের চেয়ে অপর উন্নত। কাউকে বিচার করতে হলে সততা ও খোদাভীতির আলোকেই তাকে বিচার করতে হবে। খোদাভীতি এমন একটি গুণ যা প্রতিটি মানুষ নিজের আগ্রহ ও জ্ঞান ব্যবহার করে অর্জন করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা শুধু তাকওয়া এর দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বকেই স্বীকৃতি প্রদান করেন সে নারী হোক বা পুরুষ।

নারী-পুরুষের সাম্য ও সাদৃশ্য সম্পর্কে কুরআনের বহু স্থানে আলোচনা হয়েছে। যে কোন মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ হল ঈমান ও তাকওয়া। নিজের চেষ্টা সাধনা দ্বারাই একজন লোককে তাকওয়া অর্জন করতে হয়। সবাই নয়, শুধু যারা আল্লাহ তাআলার পথে চলবে বলে ফায়সালা করে নিয়েছে, তারাই তাকওয়া অর্জন করতে পারে। মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে একথা সবার ভালভাবে জানা আছে যে, ব্যক্তি চরিত্র গঠনে বংশ ও পরিবেশ ভূমিকা পালন করে।

যে সমাজে সৎপথে থেকে জীবন-যাপনের সকল প্রকারের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে সে সমাজেও কোন ব্যক্তি ইচ্ছে করলে চূড়ান্ত রকমের দুশ্চরিত্র হতে পারে। আবার একটি নষ্ট সমাজে বসবাস করেও একজন লোক সৎভাবে জীবন-যাপন করতে পারে। কুরআনের যে সকল অধ্যায়ে লূত আ. এবং ফিরআউনের এ কথা এসেছে সে সকল অধ্যায়ে এ ব্যাপারে দৃষ্টান্ত হিসেবে লূত আ. এর স্ত্রী এবং ফিরআউনের স্ত্রীর কথা উল্লেখিত হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে মর্যাদা আল্লাহ তাআলা নারীদের দান করেছেন সেটা হল নারীদের মধ্যে যারা সৎ ও খোদাভীরু তারা মানব জাতির জন্যে অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছেন। কুরআন গোটা মানবজাতিকে মরিয়ম আ. এবং ফিরআউনের স্ত্রী আছিয়ার পথ অনুসরণের কথা বলেছে। তাকওয়া ও দৃঢ়চেতা ঈমানদার হিসেবে এ দু'জন নারী অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

উপসংহার

আল্লাহ্ তাআলার বিধান শাশ্বত। এই বিধানের মাধ্যমেই সৃষ্টি জগতের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই সত্য ও সঠিক জীবন ব্যবস্থাই মানব জাতির জন্য একমাত্র গ্রহণীয় জীবন ব্যবস্থা। প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম নারীর মর্যাদার কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু বর্তমানে একশ্রেণীর মানুষ নারী স্বাধীনতার কথা বলে নারীকে ভোগ পণ্য বানাতে চায়। নারীকে অধিকার আদায়ের নামে রাস্তায় নামিয়ে নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য স্বার্থ হাসিল করতে চায়। তারা এ আধুনিকতার যুগে ইসলামকে অচল সাব্যস্ত করার জন্য বিভিন্ন প্রোপাগান্ডায় লিপ্ত। একদিকে নারীর অধিকার আদায়ের শ্লোগান অন্যদিকে জাহিলী যুগের মত নারীদের সাথে পাশবিক আচরণ। আজ নারীর চিন্তনীয় বিষয়, এদের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী কারা ? আসুন! তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করি। তাহলে নিশ্চয় ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র আমাদের ন্যায্য অধিকার প্রদানে বাধ্য হবে।

তথ্যনির্দেশ

১. খালেক, আবদুল, *নারী ও সমাজ*, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ.১-৬
২. আস্ সাবাঈ, ড. মুসতাফা, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, আকরাম ফারুক অনূদিত, ঢাকাঃ ইসলামিক সেন্টার বাংলাদেশ, ২০০২, পৃ. ১০-১২
৩. প্রাগুক্ত
৪. খালেক, আবদুল, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত
৫. আস্ সাবাঈ, ড. মুসতাফা, *আল মারআ বায়নাল ফিকহী ওয়াল কানূন*, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি, পৃ. ১২-১৫
৬. রহীম, মুহাম্মাদ আবদুর, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' ১৯৮৩, পৃ. ৪৭
৭. ইসলাম, ড. মো. শফিকুল, *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃ.১৭০
৮. প্রাগুক্ত
৯. সুর, অতুল, *ভারতের বিবাহের ইতিহাস*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স', ১৩৮০বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯০-১৩০; বন্দোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র, বেদবাণী,পৃ. ৩২৪-৩২৭
১০. প্রাগুক্ত
১১. খান, মুহিউদ্দিন, *মাসিক মদীনা*, ঢাকা ঃ মদীনা ভবন, বাংলা বাজার, ১৯৯৪, সংখ্যা- আগষ্ট, পৃ.১৪
১২. খালেক, আবদুল, প্রাগুক্ত
১৩. ওবায়দী, ইসহাক, *যুগে যুগে নারী*, ঢাকা : শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ.২০-২৫
১৪. আল কুরআন : ২৮:২৩-২৪
১৫. ওবায়দী, ইসহাক, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪-২৭
১৬. রহীম, মুহাম্মাদ আবদুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৬

১৭. বাসেত, ডা. আবদুল, *নারীর মর্যাদা : ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মে,* দৈনিক ইনকিলাব, ১১ এপ্রিল, ২০০৫, পৃ. ১৩
১৮. আদ্- দারিমী, ইমাম, *আস সুনান,* মুকাদ্দিমা, অনুচ্ছেদ : ২৮
১৯. মুসলিম, ইমাম, *আসসহীহ,* অধ্যায় : আত তালাক, অনুচ্ছেদ : ৫, ইউ.পি : মাতবায়া' আসাহহুল মাতাবী', ১৯৮৫
২০. নাসাঈ, ইমাম, *আস সুনান,* অধ্যায় : আন নিকাহ ইউ.পি : মাতবায়া' আসাহহুল মাতাবী', ১৯৮৫
২১. তিরমিযী, ইমাম, *জামি' তিরমিযী,* অধ্যায় : আননিকাহ, ইউ.পি : মাতবায়া' আসাহহুল মাতাবী', ১৯৮৫
২২. আবূ দাউদ, ইমাম, *আস সুনান,* অধ্যায় : আননিকাহ
২৩. ইবনে মাজাহ, *আস সুনান,* অধ্যায় : আননিকাহ
২৪. মারগিনানী, আল্লামা বুরহানুদ্দীন, *আল হিদায়া,* অধ্যায়ঃ আত তালাক ইউ.পি : মাতবায়া' আসাহহুল মাতাবী', ১৯৮১
২৫. আল কুরআন ২৮:২৮
২৬. বুখারী, ইমাম, *আসসহীহ,* ইউ.পি : মাতবায়া' আসাহহুল মাতাবী', ১৯৮৫, খ. ২, পৃ. ৫৮৯
২৭. প্রাগুক্ত, খ. ১,পৃ.৩৮০
২৮. ইবনে হাম্বল, ইমাম, আহমদ, *মুসনাদে আহমদ,* তা.বি. খ. ৬,পৃ.২৯১
২৯.আল কাসানী, *বাদাঈ আস সানাঈ ফী তারতিবিশ শারাই,* বৈরূত : ১৯৭৪, খ.৭, পৃ.৩
৩০. বুখারী, ইমাম, *আসসহীহ,* প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ.১০৫৭
৩১. আল কুরআন ৯:৭১
৩২. ইবনে সা'দ, *আত তাবাকাত আল কুবরা,* তা. বি. খ. ৮, পৃ. ১৯৩
৩৩. ইবনে হিশাম, *আস সিরাত আন নববিয়্যাহ,* খ. ৩, তা. বি. পৃ. ২৮-৩১
৩৪. আসকালানী, ইবনে হাজার, তা.বি., *ফাতহুল বারী,* খ. ৭, পৃ.২৮০-২৮৮
৩৫. বুখারী, ইমাম, *আসসহীহ,* প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.৪০৩
৩৬. ইবনে হাম্বল, ইমাম, আহমদ, *মুসনাদে আহমদ,* তা. বি. খ. ৫, পৃ.৮০
৩৭. ইবনে সা'দ, *আত তাবাকাত আল কুবরা,* প্রাগুক্ত খ. ৮, পৃ.৩০২
৩৮. আল কুরআন, ৪:৩৫
৩৯. আল কুরআন, ৪৯:১৩
৪০. আল কুরআন, ২:২২৮
৪১. আল কুরআন, ৩৩:৩৩
৪২. আল কুরআন, ৪:৭
৪৩. আল কুরআন, ৪:১২
৪৪. আল কুরআন, ৪:৪
৪৫. আল কুরআন, ২:২৩৩
৪৬. আল কুরআন, ১৩:৪৯
৪৭. আল কুরআন, ৪:১
৪৮. বুখারী, ইমাম, *আসসহীহ,* অধ্যায় : আল ইস্তিযান, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২২
৪৯. আবু দাউদ, ইমাম, আস আস *সুনান,* আবওয়াবুন নাউম, অনুচ্ছেদ : ফী ফাযালি মান আলা ইয়াতামা, ইউ.পি : মাকতাবা রশিদিয়া, তা.বি.,
৫০. মাজাহ, ইমাম, *সুনান,* ইউ.পি : মাকতাবা রশিদিয়া, দিল্লী'তা.বি., অধ্যায়ঃ স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ, হাদীস নং- ১৯৭৭
৫১. আল কুরআন, ৩১:১৪
৫২. আল কুরআন, ১৭:২৩

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ ৭, সংখ্যা ২৫
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১১

মুজতাহিদগণের মতপার্থক্য : একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ নাজমূল হুদা সোহেল*

[সারসংক্ষেপ : সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে ইজতিহাদী বিষয়ে মতপার্থক্য ছিল। এই মতপার্থক্য কখনো মুজতাহিদগণের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও খামখেয়ালীর কারণে সৃষ্টি হয়নি। বরং এর ভিত্তি হলো কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কিরামের আছার। ইসলাম মানবজাতির জন্য একটি সার্বজনীন জীবন কাঠামো নির্ধারণ করে দিয়েছে। জীবনের নতুন নতুন বিষয়ে মুজতাহিদগণের গবেষণা এই কাঠামোর অধীন। আর বিধান উদ্ভাবনে মুজতাহিদগণের মতপার্থক্য ইসলামের জন্য ক্ষতিকর নয়; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা শরীয়তের অনুসরণকে সহজতর করে দেয়। সত্যনিষ্ঠ মুজতাহিদগণ কখনোই ইজতিহাদকে গোঁড়ামী ও বিবাদ-বিসম্বাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেননি। যদি ভিন্ন কোনো মতও সত্য বলে প্রতিভাত হতো সেটি তাঁরা গ্রহণ করে নিতেন। ইসলামী আইন মানব প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ। এটি সকল যুগের প্রয়োজনকে আল্লাহর বিধানের ছাঁচে ধারণ করে নিতে সক্ষম। তাই শরীয়তের আনুষঙ্গিক বিষয়ে চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সমকালীন মুজতাহিদগণের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। তবে লক্ষ রাখতে হবে, এক্ষেত্রে সৃষ্ট মতপার্থক্যের কারণে সংকীর্ণতার যেন আমাদের সত্যনিষ্ঠা ও উদার চিন্তাকে চেপে রাখতে না পারে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে মতপার্থক্যের এই প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক ও স্বাভাবিক হিসেবে প্রমাণ করা হয়েছে। তাই অত্র প্রবন্ধে ফিকহ এর পরিচয়, ফিকহ চর্চার ক্রমবিকাশ, মাযহাবের প্রেক্ষাপট ও তার বিকাশ, প্রসিদ্ধ মাযহাবসমূহ ও স্বতন্ত্র গবেষণা মূলনীতি, ফকীগণের মতপার্থক্যের কারণ ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হবে।]

ফিকহ্-এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ : 'ফিকহ' শব্দটি আরবী। সাধারণ অর্থ ঃ বুঝ, হৃদয়ঙ্গম, উপলব্ধি, অনুধাবন ইত্যাদি। আল-কামূস ও আল-মিসবাহুল মুনীর অভিধানে এরূপ অর্থই করা

---

* শিক্ষার্থী, কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, সৌদী আরব

হয়েছে। আল্লামা রশীদ রেযা মিসরী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে (আল মানার) বলেছেন, ফিক্‌হ শব্দটি পবিত্র কুরআনের বিশটি স্থানে এসেছে, তন্মধ্যে উনিশ স্থানে তা 'সূক্ষ্মজ্ঞান' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পারিভাষিক অর্থ : ফকীহ্‌গণের মতে, কুরআন সুন্নাহ'য় বর্ণিত বিধান অথবা ইজমাপ্রসূত অথবা শরীয়ত সমর্থিত কিয়াসের ভিত্তিতে উদ্ভাবিত বিধান অথবা উপরোক্ত দলীলসমূহের আশ্রয়ী দলীলের ভিত্তিতে গঠিত শরীয়তের ব্যবহারিক কিছু বিধান দলীলসহ বা দলীল ছাড়া আয়ত্ত করাকে ফিক্‌হ বলে।

কি পরিমাণ জ্ঞান আয়ত্ত করলে কোন ব্যক্তিকে ফকীহ্ উপাধি দেয়া যেতে পারে, সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ফকীহ্‌গণ আলোচনা করে বিষয়টি স্থানীয় উরফ (Custom) এর উপর ছেড়ে দিয়েছেন। আমাদের বর্তমান উরূফ অনুযায়ী যিনি ফিক্‌হের সুবিস্তৃত, যিনি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, গভীর উপলব্ধি শক্তির অধিকারী, সুস্থ ফিকহী স্বভাবসম্পন্ন তাকে জাত ফকীহ্ (فقيه النفس) বলা হয়।[১]

উসূলবিদগণের মতে, ফিকহ হলো العلم بالاحكام الفرعية العملية المستمدة من الادلة التفصيلية।

অর্থঃ 'বিশদ দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে সংকলিত ব্যবহারিক শরীয়তের আনুষঙ্গিক বিষয়ের বিধান সম্পর্কিত জ্ঞানকে ফিকহ্ বলে।'

মুকাল্লিদকে ফকীহ্ বলা যায় না, যদিও তিনি ফিকহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হন। তাদের মতে, তিনিই ফকীহ্ হতে পারেন যার উদ্ভাবনী (ইসতিমবাত) দক্ষতা ও প্রতিভা আছে এবং যিনি বিস্তারিত দলীল প্রমাণ থেকে বিধাসমূহ উদ্ভাবনে সক্ষম। ইসতিমবাতের এই যোগ্যতা থাকলে ফকীহ্ হওয়ার জন্য আনুষঙ্গিক সকল বিধান সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকা জরুরি নয়।[২]

ফিকহ্ চর্চার ক্রম-ইতিহাস

রসূলুল্লাহর স. যুগে ওহীর মাধ্যমেই সকল সমস্যার সমাধান করা হতো। আইন প্রণয়ন, উদ্ভূত পরিস্থিতির মুকাবিলায় প্রয়োজনীয় ফতওয়া, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি সকল কাজ ও ওহীর মাধ্যমে তিনি নিজেই সম্পাদন করতেন। যে সব বিষয়ে সরাসরি ওহীর নির্দেশনা ছিল না সে ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ স. ইজতিহাদ করতেন অথবা সাহাবীদের কেউ কেউ ইজতিহাদ করে তাঁকে জানানোর পর তিনি ওহীর ভিত্তিতে তা গ্রহণ কিংবা বাতিল করতেন। সে সময় ইসলাম আইনের দু'টি উৎস ছিল। কুরআন ও রসূলুল্লাহ স. এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কিরামের

যুগে বিভিন্ন দেশ জয় ও নানাপ্রকার সামাজিক সংশ্লিষ্টতার কারণে মুসলিম বিশ্বের নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিতে থাকে। এ সমস্যার সমাধানকল্পে আরো দু'টি উপায় অবলম্বিত হয়। তাহলো সাহাবায়ে কিরামের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত (ইজমা) এবং বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের ব্যক্তিগত ইজতিহাদপ্রসূত মতামত। একে কিয়াসের ভিত্তি বলা হয়। পরবর্তীতে এটিই ইসলামী আইনের চতুর্থ উৎস হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ফতওয়াদানকারী সাহাবীদের মধ্যে উমর ইবনুল খাত্তাব, আলী, যায়েদ ইবনে সাবিত, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুয়ায ইবনে জাবাল ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. অন্যতম।

সাহাবায়ে কিরামের পর তাবিঈদের যুগ। তারা কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান সরাসরি সাহাবায়ে কিরামের নিকট থেকেই সংগ্রহ করেছেন। প্রয়োজন ও পরিস্থিতির আলোকে তাঁরাও সাহাবায়ে কিরামের ন্যায় চিন্তা-গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দিহলভী বলেন, সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব ও ইবরাহীম আন-নাখই র. প্রমুখ বিশেষজ্ঞ তাবিঈ ফিকহের কিছু উসূল (মূলনীতি) অনুসরণ করতেন। এ যুগে মুসলিম বিশ্বে দু'টি চিন্তাগোষ্ঠীর (School of thought) উন্মেষ ঘটে। একটি ছিল হিজায বা আরব উপদ্বীপকেন্দ্রিক যারা ফিকহী ইজতিহাদের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ'র মূল নস (Text) কে প্রাধান্য দিতেন। অপরটি ছিল ইরাককেন্দ্রিক, যেখানে কুরআন সুন্নাহ'র পাশাপাশি ব্যাপকভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির আশ্রয় নেয়া হতো। খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আযীযের শাসনামলকে তাবে-তাবিঈন যুগের সূচনা হিসাবে গণ্য করা হয়। উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে কুরআন ছাড়া হাদীস ও ফিকহের উপর বিশেষ কোন গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়নি। এ যুগে খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আযীযের নির্দেশে রসূলুল্লাহ স. এর হাদীস, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈনের ফতওয়া (ব্যক্তিগত অভিমত যৌথভাবে) লিপিবদ্ধ করার কাজ আরম্ভ হয়। এ যুগটি কুরআন-সুন্নাহ ও ফিকহ বিষয়ক গবেষণা ও সংকলনের ক্ষেত্রে উন্নতির সাক্ষ্য বহন করে। এ যুগের শেষ দিকে স্বতন্ত্র ফিকহী মাযহাবের আত্মপ্রকাশ ঘটতে শুরু করে। বড় বড় ইমাম বিভিন্ন মাযহাবের মুজতাহিদ ও আহলুত তারজীহগণ এ সময় 'ইলমুল ফিকহ' চর্চা ও গবেষণায় অসামান্য অবদান রাখেন।

মাহযাবের প্রেক্ষাপট ও তার বিকাশ

আরবী মাযহাব (مذهب) শব্দের অর্থ-মত, মতবাদ, শিক্ষা, School, Orthodox[৩] ইত্যাদি। কুরআন ও সুন্নাহ হতে বিধান উদ্ভাবনে মতভেদ থেকে সৃষ্ট মুসলমানদের

মধ্যে বিভক্ত চিন্তাগোষ্ঠীসমূহ (School of thought) কে বুঝতে মাযহাব শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

হিজরী তৃতীয় শতক পর্যন্ত মাযহাবের ধারণা মুসলমানদের মধ্যে পরিচিত ছিল না এবং চতুর্থ হিজরী শতকের পূর্বে মুসলমানগণ নির্দিষ্ট কোন এক ব্যক্তির রায় ও অভিমত মেনে চলার ব্যাপারে একমত হয়নি। হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে তারা কোন বিশেষ ব্যক্তির কথা বা রায় উদ্ধৃত করতেন না। কোন ব্যক্তির মতামতের ভিত্তিতে ফওতয়াও দিতেন না। কোন বিশেষ ব্যক্তির ফিকহী রায়ের ভিত্তিতে ফিকহের বুনিয়াদ রাখতেন না। উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ মনীষী শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দিহলভী তার বিখ্যাত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে চতুর্থ হিজরী শতকের পূর্বে ও পরে মুসলমানদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, এই দুই শতকে ব্যক্তি বিশেষের অনুকরণের কথা কেউ চিন্তাই করেনি। হাদীস বিশারাদগণের কাছে ছিল অসংখ্য সহীহ্ হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের 'আছার' তথা তাদের কথা ও কার্যক্রম। এসবের ভিত্তিতে তাঁরা ফতওয়া দিতেন। এমন সব সহীহ্ হাদীস ও আছার তাদের কাছে ছিল যেগুলোর উপর সাহাবায়ে কিরামও আমল করে গেছেন। জমহুর সাহাবা ও তাবেঈগণের এমন সব বাণী ও রায় তাদের কাছে ছিল যার বিরোধিতা করা মোটেই উত্তম ও প্রশংসনীয় কাজ বলে বিবেচিত হতো না। যদি কোথাও হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য ও অগ্রাধিকার দেয়ার কারণ সুস্পষ্ট না হতো অথবা কোন বিষয়ের সমাধানে তাদের অন্তর নিশ্চিন্ত না হতো তাহলে সেক্ষেত্রে তারা ফকীহ্গণের মধ্য থেকে কোনো একজনের সমাধান গ্রহণ করতেন। যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফকীহ্দের দুই বা একাধিক অভিমত দেখতেন তাহলেতাদের মধ্য থেকে যাকে বেশি নির্ভরযোগ্য পেতেন তার অভিমত গ্রহণ করতেন।

তবে তাদের একটি দল কোনো একটি বিষয়ে সুস্পষ্ট সমাধান না পেলে পূর্ববর্তী কোনো নির্দিষ্ট ফকীহ্ এর যুক্তির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন এবং তা থেকে সমস্যার সমাধান নির্ণয় করতেন। তাদেরকে বলা হতো 'আহলুত তাখরীজ'। তারা বিশেষ কোনো ইমাম বা ফকীহ্'র অভিমতের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করতেন। এ কারণে তাদেরকে বিশেষ মাযহাবের অনুসারী বলে উদ্ধৃত করা হতো। কাউকে হানাফী, কাউকে শাফিঈ, কাউকে মালিকী ইত্যাদি।

যেমন ইমাম নাসায়ী ও ইমাম বায়হাকীকে ইমাম শাফেয়ীর অনুসারী বলা হতো। সে সময় মুজতাহিদ ছাড়া কাউকে কাযী নিয়োগ করা হতো না এবং কারো ফতওয়াও

গ্রহণ করা হতো না। অর্থাৎ কেবল মুজতাহিদকেই ফকীহ বলা হতো। এ ছিল মুসলমানদের প্রথম তিন চারশো বছরের ফিকহচর্চা। মুসলিম চিন্তাবিদ, ফকীহ ও মুজতাহিদগণ আল্লাহর বিধানের আওতায় জ্ঞান চর্চা করে কর্ডোভা থেকে কাশগড় এবং তাসখন্দ থেকে কান্দাহার-মূলতান পর্যন্ত এক বিশাল জ্ঞানবৃত্তিক বলয় তৈরি করেন। এ সমগ্র বলয়ে চিন্তার স্বাধীনতার সাথে সাথে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাও একটি মূলশক্তি হিসাবে সর্বদা সক্রিয় ছিল। যখনই নিষ্ঠায় ঘাটতি দেখা দিয়েছে তখনই চিন্তার স্বাধীনতা ও ব্যাহত হয়েছে। খিলাফতে রাশেদার পর এমন সব লোক মুসলিম সাম্রাজ্যের কর্ণধার হলেন যারা প্রকৃতপক্ষে এর যোগ্য ও হকদার ছিলেন না এবং একই সাথে যুগসমস্যার ব্যাপারে ফতওয়া প্রদান ও পূর্ণ দীনী ইলমের অধিকারীও ছিলেন না। তাই পদে পদে তাদেরকে ফকীহগণের দ্বারস্থ হতে হতো। ফকীহ ও আলিমগণ শাসকদের এড়িয়ে চলতে চাইতেন। অনেকে তাদের দরবারে যেতে অস্বীকার করেছেন, যেমনটি আবু হানিফা, আহমাদ ইবনে হাম্বলসহ বড় বড় মুজতাহিদদের ক্ষেত্রে ঘটেছে। অথচ শাসকরা তাদের দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিতেন। ফলে একদল লোক মর্যাদা ও ক্ষমতার নাগাল পাওয়ার লক্ষে ইলম অর্জনে তৎপর হলো। এরপর থেকে একদল আলিম শাসকগোষ্ঠীর পেছনে চলতে আরম্ভ করে। এভাবে ইলম ও স্বাধীন জ্ঞানচর্চা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

ওলামা ও ফকীহগণের একটি দল এরপরও ক্ষমতার নৈকট্য এড়িয়ে চলে প্রশাসনিক প্রভাবমুক্ত স্বাধীন জ্ঞানচর্চার ধারা সমুন্নত রাখেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় ইসলামী জ্ঞানচর্চা পরবর্তীতেও আল্লাহর বিধানের আওতাধীন থেকেছে। অবশ্য শাসকদের প্ররোচনায় ক্ষমতার নৈকট্য প্রত্যাশী ওলামায়ে কিরাম দীনের যুগোপযোগী ধারা সৃষ্টি করার পরিবর্তে জ্ঞানচর্চাকে মাসায়েল ভিত্তিক বিরোধ ও বিতর্কের চারণভূমিতে পরিণত করেন। এই বিতর্কের ক্ষেত্রে তারা বিশেষ করে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ীর বিরোধমূলক মাসায়েল নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করেন। এই বিরোধ ও বিতর্ককে কেন্দ্র করে তারা অসংখ্য গ্রন্থ রচনা ও মাসায়েল ইসতিম্বাত করেন। এভাবে চলতে থাকার পর ধীরে ধীরে ইজতিহাদ ও নতুন উদ্ভাবনে যেমন ভাটা পড়তে থাকে তেমনি তাকলীদ ও বিশেষ ব্যক্তির রায় ও মাযহাব অনুসরণ করার প্রবণতা বাড়তে থাকে। কালক্রমে বিশেষ বিশেষ মুজতাহিদ ইমাম ও তাঁর নামে প্রচলিত মাযহাবের তাকলীদ সমগ্র মিল্লাতের উপর নিশ্চিন্ততা ও নির্ভরতা অনুভব করতে থাকে। এমনকি কেউ কেউ ইজতিহাদের দরজা বর্তমানে বন্ধ নাকি উন্মুক্ত এ নিয়ে অনাবশ্যক

বিতর্কেও জড়িয়ে পড়েন।[৪] উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ মাযহাবের ইমাম তাঁদের জীবদ্দশায় নিজ নামে কোন মাযহাবের প্রবর্তন করেননি; বরং তাদের মৃত্যুর পর তাঁদের ছাত্র ও অনুসারীগণ সংশ্লিষ্ট ইমামের মূলনীতির আলোকে ও তাঁর নামানুসারে বিশেষ বিশেষ মাযহাবের প্রবর্তন ও প্রসারের ব্যবস্থা করেন।

প্রসিদ্ধ মাযহাবসমূহ ও স্বতন্ত্র গবেষণা মূলনীতি

১. হানাফী মাযহাব : হানাফী মাযহাবের ইজতিহাদের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায়।[৫]

ক. আল কুরআন

বিধান উদ্ভাবনে কুরআনের হুবহু আক্ষরিক অর্থ আঁকড়ে না ধরে তার সাথে বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য, জনকল্যাণ (মাসলাহ্) ও ইসলামের প্রাণশক্তিকেও বিবেচনা করা;

খ, সুন্নাহ

১. মুতাওয়াতির ও মাশহুর হাদীস গ্রহণ করা;

২. আহাদ হাদীস গ্রহণে নিম্নোক্ত শর্তারোপ করা–

ক. হাদীসটি বিশ্বস্ত আলিমগণের নিকট প্রসিদ্ধ করা;

খ. বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী কোন ফতওয়া বা কাজ না করা।

গ. হাদীসের বিষয়বস্তু অকল্যাণের সহায়ক না হওয়া।

৩. ইজমা

ইজমা'কে দলীল হিসাবে গণ্য করা।

৪. সাহাবীদের মতামত

১. কিয়াস ও সাহাবীর মতামতের মধ্যে বিরোধ থাকলে কিয়াসকে প্রাধান্য দেয়া।

২. তাবেয়ীদের মতামত দলীল হিসাবে বিবেচনা না করা।

যেমন আবু হানীফা র. বলেছেন, "আমি আল্লাহর কিতাব ও রসূলুল্লাহ স. এর সুন্নাহ'য় কোন বিষয় না পেলে যতটুকু ইচ্ছা সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্য গ্রহণ করেছি এবং যতটুকু ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করেছি। অতপর আমি সাহাবীদের মতের বাইরে অন্য কারো মতামত গ্রহণ করিনি"।[৬]

৫. ইসতিহ্সান

আবু হানিফা র. ইসতিহ্সানকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন।

ঙ. উর্‌ফ

আবু হানিফা র. ইসলামের প্রাণসত্তার সাথে সাংঘর্ষিক নয়, এমন উর্‌ফ (প্রথা)-কে সাধারণ মূলনীতির উপর প্রাধান্য দিতেন।

মালিকী মাযহাব

ক. আল কুরআন

কুরআনের সরাসরি অর্থ গ্রহণ করা;

খ. আস সুন্নাহ

১. খবরে আহাদ গ্রহণে আবু হানিফা র. প্রদত্ত শর্তাবলীতে মালিকী মাযহাব একমত নয়।

২. মুরসাল হাদীস গ্রহণ করা।

৩. মদীনার বিশেষজ্ঞ আলিমদের মতামতকে খবরে আহাদের উপর প্রাধান্য দেয়া।[৭]

গ. ইজমা'

ইজমা' ইসলামী আইনের উৎস হিসাবে বিবেচিত।

ঘ. সাহাবীদের মতামত

১. মারফূ' হাদীসের পরিপন্থী না হলে খুলাফায়ে রাশেদীনসহ বড় বড় সাহাবীদের মতামত গ্রহণ করা।

২. সাহাবীদের মতামতকে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দেয়া।

ঙ. কিয়াস

গ্রহণযোগ্য দলীল। কিন্তু ইমাম মালিক র. খবরে আহাদ, সাহাবীদের মতামত ও মদীনাবাসীদের রায়কে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিতেন।[৮]

চ. ইসতিহসান

জনকল্যাণের ভিত্তিতে ইসতিহসান গ্রহণ করা। মালিকী-মাযহাবে এর নাম ইসতিসলাহ।

ছ. سد الذرائع বা 'সূত্র বন্ধ করা' মূলনীতি অবলম্বন।

৩. শাফেঈ মাযহাব

ইসলামী আইন গবেষণায় মাযহাবের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

ক. আল কুরআন

আয়াতের উদ্দেশ্য ভিন্ন কিছু হলেও কুরআনের সরাসরি অর্থ গ্রহণ করার প্রতি গুরুত্বারোপ।

খ. সুন্নাহ

১. হাদীসের বর্ণনাকারীর তার পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী থেকে সরাসরি শোনার শর্তারোপ করা।

২. খবরে আহাদ গ্রহণে হানাফী মাযহাবের শর্তাবলীর সাথে শাফেঈগণ একমত নন।

৩. মদীনাবাসীদের এক রায়কে খবরে আহাদের উপর অগ্রাধিকার প্রদান সংক্রান্ত ইমাম মালিক এর অভিমতকে শাফেঈ-মাযহাব স্বীকৃতি দেয়নি।

৪. মুরসাল হাদীস গ্রহণে শাফেঈ মাযহাবের অবস্থান তিন মাযহাব থেকে ভিন্ন। তারা সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব র. ব্যতীত অন্য কারো মুরসালে হাদীস গ্রহণ করেন না।

গ. সাহাবীদের মতামত

ইমাম শাফেঈ সাহাবীদের মতামতকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেননি। কেননা এসব মতামত ব্যক্তিগত রায় ও ইজতিহাদ প্রসূত হওয়ায় তাতে ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে।

ঘ. ইজমা

শাফেঈ মাযহাব ইজমাকে ইসলামী পদ্ধতি অনুসরণ করা এবং কোন হাদীস ও খবরে আহাদের পরিপন্থী না হওয়া।

চ. ইসতিহসান

শাফেঈ মাযহাব ইসতিহসান সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন।

ছ. ছাদ্দুয্ যারাঈ' মূলনীতি তারা গ্রহণ করেননি।[১০]

৪. হাম্বলী মাযহাব

হাম্বলী মাযহাবের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো–

ক. বিধান উদ্ভাবনে কুরআনুল কারীম ও সহীহ হাদীসকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া।

খ. সাহাবীদের সর্বসম্মত অভিমতকে আইনের উৎস হিসাবে গ্রহণ করা এবং তাকে কিয়াস ও কোন সাহাবীর ব্যক্তিগত অভিমত বা কাজের উপর প্রাধান্য দেয়া। হাম্বলী মাযহাবে সাহাবীদের ঐকমত্যকে ইজমা' নামে অভিহিত করা হতো না। কোন বিষয়ে সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ থাকলে যে মতটি কুরআন ও সুন্নাহ-এর অধিক নিকটবর্তী তা গ্রহণ করা।

গ. দুর্বল (যইফ) ও মুরসাল হাদীস গ্রহণ করা এবং দুর্বল হলেও হাদীসকে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দেয়া।

ঘ. হাম্বলী মাযহাবে মাসালিহে মুরসালাহ (পরিবর্তিত জনকল্যাণ) ও ছাদ্দুয্ যারাঈ (অকল্যাণের উৎস বন্ধ করে দেয়া) শরীয়তের উৎস হিসাবে পরিগণিত।

প্রসিদ্ধ চারটি মাযহার ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করার পূর্বে কিছুকাল যাবৎ নিম্নবর্ণিত মাযহাবগুলো প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। যেমন ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম হাসান বসরী, ইমাম আওযায়ী, ইমাম আবু সাওর, ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়, ইবনে জারীর তাবারী ও লাইস ইবনে সা'দ র. এর মাযহাব। পরবর্তী সময়ে এসব মাযহাব বিলুপ্ত হয়ে যায়। শুধু হানাফী, মালিকী, শাফেঈ ও হাম্বলী এ চারটি মাযহাব সারা বিশ্বে ব্যাপকতা লাভ করে। আহলে হাদীস নামে আরেকটি দল রয়েছে, যারা কুরআন-হাদীসের অনুসরণ ব্যতীত কোন মাযহাব অনুসরণ না করার দাবি করেন।

শরীয়তের ইজতিহাদী মাসআলাসমূহের বিধান উদ্ভাবনে মুজতাহিদ ফকীহগণের মতপার্থক্যের কারণকে সামগ্রিকভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়–

ক. শরীয়তের মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহ'র দিকে প্রত্যাবর্তনকারী মতপার্থক্য;

খ. শুধু সুন্নাহ সংশ্লিষ্ট মতপার্থক্য;

গ. ভাষা ও উসূলের মূলনীতি বিষয়ক মতপার্থক্য।

নিম্নে উদাহরণসহ এই কারণগুলো বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।–

ক. মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহ্ উদ্ভূত মতপার্থক্য : এ ধরনের মতভেদকে দুই স্তরে বিভক্ত করা যায়।

প্রথমত : কুরআন ও হাদীসের নস (Text) এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী মতপার্থক্যসমূহ

এ ধরনের মতপার্থক্য চার কারণে হতে পারে।–

এক. মুশতারাকা বা বিভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহার

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কিছু مشتركة শব্দের ব্যবহার রয়েছে, যেগুলো একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ থাকে।

দৃষ্টান্ত-১ : আল্লাহর বাণী

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

"তালাক প্রাপ্ত স্ত্রী তিন কুরু কাল প্রতীক্ষায় থাকবে।"[১১]

ইমাম আবু হানিফা র. এর মতে, আয়াতে قروء শব্দ দ্বারা হায়েয বুঝানো হয়েছে। অন্য দিকে ইমাম শাফেই র. এর মতে, শব্দটির অর্থ তুহর। আবরদের নিকট দু'টি অর্থই প্রচলিত রয়েছে।

দৃষ্টান্ত -২ : রসূলুল্লাহ স. বলেছেন-

قصوا الشوارب واعفوا اللحى -

"তোমরা গোঁফ ছেঁটে ফেলো এবং দাঁড়ি ছেড়ে দাও।"
হাদীসে ব্যবহৃত اعفوا এর অর্থ কেউ কেউ করেছেন বৃদ্ধি করা। আবার কারো মতে অর্থ হবে ছাঁটা বা হ্রাস করা। শব্দটি আরবী ভাষায় উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে।

দ্বিতীয়ত : শব্দের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অর্থ

ফকীহগণের মতপার্থক্যের আরেকটি কারণ, কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের প্রত্যক্ষ (হাকীকী) ও পরোক্ষ (মাজাযী) দু'ধরনের অর্থ থাকা। এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শব্দের অর্থ নির্ধারণে দ্বিধার সম্মুখীন হতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ–

দৃষ্টান্ত- ১
আরবী الوطء শব্দের প্রত্যক্ষ বা সরাসরি অর্থ পদদলিত করা।[১২] কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে শব্দটি সহবাস অর্থেই বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। কেননা 'পদদলন' অর্থ স্ত্রীর সম্মান ও মর্যাদার সাথে বেমানান। তাই অবস্থানুসারে শব্দটির অর্থ গ্রহণ করতে হবে।

দৃষ্টান্ত- ২
আল্লাহর বাণী : او لامستم النساء ও ملامس শব্দের অর্থ-হাত দ্বারা স্পর্শ করা। কিন্তু হানাফী মাযহাবের মতে, বিভিন্ন ইংগিত ও প্রাসংগিকতার কারণে শব্দটির প্রত্যক্ষ অর্থ গ্রহণ না করে পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করতে হবে। তা হলো- সহবাস।
উল্লেখিত শব্দ দু'টির দ্বিবিধ অর্থ থাকায় ফকীহগণ পারিবারিক ও তাহারাত সংক্রান্ত বিভিন্ন মাসআলায় মতভেদ করেছেন।

দৃষ্টান্ত- ৩
রসূলুল্লাহ স. এর হাদীস لا صلاة لمن لم يقرا بام القران 'সূরা ফাতেহা তিলাওয়াত না করলে নামায হবে না'। অন্যত্র এসেছে لا أيمان لمن لا أمانة له 'যার আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই'। হাদীসে ব্যবহৃত। النا فية প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দু'ধরনের অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রত্যক্ষ অর্থ হলো نفى الذات বা সত্তাকে না সূচককরণ, আর পরোক্ষ অর্থ হলো পূর্ণতা ও শুদ্ধতাকে না-সূচককরণ।
প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যায় পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করে শাফেঈ মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, সূরা ফাতেহা ব্যতীত নামায শুদ্ধ হবে না। হানাফী মাযহাবের মতে নামায পূর্ণতা পাবে না।[১৩]

তিন. নাস্‌খ (রহিত) সংক্রান্ত বিতর্ক

কুরআনের নাসেখ (রহিতকারী) ও মানসূখ (রহিত) আয়াত নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। কেউ কেউ 'নসখ' এর অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। যারা স্বীকার করেন তাদের কেউ বলেন শুধু কুর্আন দ্বারা কুরআন মানসূখ করা যায়। কারো মতে, সহীহ হাদীস দ্বারাও কুরআনের আয়াত মানসূখ হতে পারে।

দৃষ্টান্ত-১

কুরআন দ্বারা কুরআন রহিতকারী সূরা বাকারার ১৮০ নং আয়াত–

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرَنِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ -

"তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পদ রেখে যায় তবে ন্যায়ানুগ প্রথানুযায়ী তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের ওসিয়াত করার বিধান তোমাদেরকে দেয়া হলো।"

এটি সূরা নিসার ১১নং আয়াত দ্বারা মানসূখ করা হয়েছে।

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ

"আল্লাহ তোমদের সন্তান সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন: এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান।"

চার. ইংগিত বিহীন আদেশ ও নিষেধসূচক শব্দ নিয়ে মতভেদ

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ আদেশ (الأمر) ও সাধারণ নিষেধ (النهى) সূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে আদেশটি ফরয নাকি নফল নাকি বৈধতার অর্থে ব্যবহৃত হবে এবং নিষেধটি হারাম নাকি মাকরূহ অর্থ বুঝাবে? এ নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়।

واشحدوا اذا تبايعتم

দৃষ্টান্ত-১

আল্লাহর বাণী– "তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রেখো।[১৪]

এবং জুম'আর আদেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন' وذروا البيع 'এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর।'[১৫]

আয়াতদ্বয়ে উল্লেখিত اشهدوا এবং وذروا ফরয, নফল নাকি বৈধতার অর্থে প্রয়োগ হবে এ নিয়ে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেননা আরবী ভাষায় আমরের

শব্দ কখনো কখনো নফল বা মুবাহ অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং নাহীর শব্দ মাকরূহ (অপছন্দনীয়) অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টান্তও রয়েছে।

এ জাতীয় মতপার্থক্যের উদাহরণ হলো-

এক. বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নস বুঝার ক্ষেত্রে মতভেদ

রসূলুল্লাহ স. এর বাণী :

لايصلين احد العصر إلافى بنى قريظة -

"তোমাদের কেউ বনু কুরাইযায় পৌঁছার আগে আসর নামায পড়বে না"।[১৬]

এই নির্দেশকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট সাহাবীগণের মধ্যে দু'টি মত তৈরী হলো। একদল সাহাবী হাদীসটির সরাসরি অর্থ গ্রহণ করে বনু কুরাইযায় পৌঁছা পর্যন্ত আসরের নামায আদায় করা থেকে বিরত থাকলেন। বাকীরা নসের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের দিকে লক্ষ করে বুঝলেন রসূলুল্লাহর স. এই বাণীর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যতদ্রুত সম্ভব বনু কুরাইযায় পৌঁছা, আসরের নামায আদায় করতে নিষেধ করা নয়। তাই তারা পথিমধ্যে নামায আদায় করে নিলেন।[১৭]

মদীনায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ স. কে বিষয়টি জানানোর পর তিনি বললেন, উভয় দলই সত্যের উপর রয়েছে।

দু'টি পরস্পরবিরোধী হাদীসের সনদে ভিন্নতা থাকলে মুতাওয়াতির হাদীস মাশহূর হাদীসের উপর প্রাধান্য পাবে আর নসের মতন বা মূল বক্তব্যে ভিন্নতা দেখা দিলে অর্থাৎ কোনটি আদেশসূচক এবং অন্যটি নিষেধসূচক হলে হ্যাঁ সূচক নির্দেশ না সূচকের উপর প্রাধান্য পাবে। তেমনি দু'টি নস এর একটি প্রত্যক্ষ (হাকীকী অর্থ এবং অন্যটি পরোক্ষ (মাযাযী) অর্থ প্রদান করলে প্রত্যক্ষ অর্থকে পরোক্ষ অর্থের উপর প্রাধান্য দেয়া হবে।

এরূপ মতানৈক্যের ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণ তিনটি পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে অবলম্বন করতে পারেন।–

১. বিবদমান দু'টি নসের অর্থের মধ্যে তা'বীল ও সমন্বয় সাধন করা;

২. সমন্বয় সম্ভব হলে নসখের (রহিত) দাবি করা এবং

৩. উপরোক্ত দু'টি পদ্ধতির কোনাটি গ্রহণ করা সম্ভব না হলে যে কোন একটি নসকে অগ্রাধিকার দেয়া।

দৃষ্টান্ত-১

ইমামের পেছনে মুক্তাদির সূরা ফাতিহা পড়া সংক্রান্ত মতভেদ। শাফেঈ ও হাম্বলী মাযহাবের মতে, ইমামের পেছনে মুক্তাদির সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। কেননা কিরাআত পড়া ওয়াজিবকারী হাদীসকে তারা অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অন্যদিকে

হানাফীগণ মুক্তাদির কিরাআত পড়া হয় তাতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব, কিন্তু জাহরী নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নয়।[১৮]

দৃষ্টান্ত-২

বাকীতে একটি পশু দু'টি পশু দ্বারা বিক্রয় সংক্রান্ত মতভেদ। ইমাম আবু হানিফার মতে, এটি জায়েয নয়। কেননা সামুরা রা বর্ণিত হাদীসে নবী করীম স. বাকীতে একটি পশুর বিনিময়ে অন্য পশু বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[১৯] অন্যদিকে ইমাম শাফেঈ নিম্নোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে একে জায়েয বলেছেন। আবু রাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

ইমাম শাফেঈর মতকে অগ্রাধিকার প্রদানকারীগণ বলেছেন, আবু রাফে' বর্ণিত হাদীস সামুরা বর্ণিত হাদীসকে রহিত করে দিয়েছে[২০]। আবার হানাফীদের মত গ্রহণকারীরা বলেন, সামুরা রা. এর হাদীস আবু রাফে' রা. এর হাদীসকে রহিত করেছে। অধিকন্তু সামুরার হাদীস সনদের দিক থেকেও অধিকতর শক্তিশালী। এ কারণে তারা হারামকে হালালের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট হাদীস কিছু ফকীহ-এর নিকট পৌছার কারণে তারা একরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যাদের নিকট হাদীসটি পৌছেনি তাদের ইজতিহাদ ভিন্ন রকম হয়েছে। সাহাবীদের মধ্যেও রসূলুল্লাহ স. এর সংস্পর্শ কম-বেশি পাওয়ায় হাদীসের জ্ঞানও তাদের মধ্যে কম-বেশি ছিলো। আমরা জানি, আবু বকর, উমর ও ওসমান রা. এর মতো রসূলুল্লাহ স. এর ঘনিষ্ঠ সাহাবীগণও কিছু হাদীস সম্পর্কে জানতেন না। পরবর্তীতে অন্য সাহাবীগণ তাদের তা জানিয়েছেন।

দৃষ্টান্ত-১

'মায়ে কাছীর' (বেশি পানি) এর পরিমাণ নিধারণ নিয়ে ফিকহী মতপার্থক্য। শাফেঈদের মতে, 'মায়ে কাছীর' এর পরিমাণ দুই মটকা। তাদের দলীল হলো,

اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا -

'পানি দুই মটকা পরিমাণ হলে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই'[২১] ইমাম আবু হানীফা ও মালেক এর নিকট হাদীসটি না পৌছায় তারা ইজতিহাদের মাধ্যমে পরিমাণ নির্ধারণের কথা বলেছেন। ফলে তাদের একেক জনের মত একেক রকম হয়েছে।

দৃষ্টান্ত-২

ইবনে আব্বাস রা.-এর নিকট আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত 'গমের বিনিময়ে গম বিক্র করো না[২১]।' এ হাদীসটি পৌছার পর তিনি রিবা আল-ফাদল সম্পর্কিত তার পূর্ব অভিমত থেকে সরে আসেন। কেননা ইতঃপূর্বে তার নিকট হাদীসটি পৌছেনি।

দৃষ্টান্ত-৩

কখনো কোনো একটি মাসআলা সম্পর্কে দু'জন মুজতাহিদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা হতো। এ আলোচনার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ স. এর কোন নতুন হাদীস তাদের সামনে আসতো এবং হাদীসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তাদের মধ্যে প্রবল আস্থা জন্ম নিতো। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট মুজতাহিদ তার ইজতিহাদ পরিত্যাগ করে হাদীসটি গ্রহণ করতেন। যেমন আবু হুরায়রা রা. এর ধারণা ছিলো– 'যার উপর গোসল ফরয হয়েছে সে যদি সূর্যোদয়ের আগে গোসল না করে, তবে তার রোযা হয় না।' কিন্তু নবী স. এর পবিত্র স্ত্রীদের কেউ কেউ যখন নবী স. এর আমলের বিপরীত ছিল বলে উল্লেখ করলেন, তখন আবু হুরায়রা রা. তাঁর পূর্ব অভিমত থেকে ফিরে আসেন।

কোন হাদীস সহীহ কিংবা দুর্বল সাব্যস্ত হয় সনদের ভিত্তিতে। আর এটি নির্ধারণে ফকীহগণ মতপার্থক্য করেছেন। যেমন কিছু ফকীহ'র মতে, অমুক বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত। কিন্তু অন্যদের মতে, তিনি বিশ্বস্ত নন। ফলে প্রথম দল তার হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করলেও অন্যরা তা গ্রহণ করেননি। অথবা কেউ বিশ্বাস করেন যে, বর্ণনাকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে হাদীসটি সরাসরি শুনেছেন, আবার অনেকে বিশ্বাস করেন রাবী সরাসরি শুনেননি। কোন হাদীস যইফ বা দুর্বল সাব্যস্ত হওয়ার পর তার উপর আমল করা নিয়েও মতভেদ রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমদের মতে, কিছু শর্ত সহকারে মুস্তাহাব ও ফাযায়েলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যাবে। কারো কারো মতে, বিধান উদ্ভাবনেও তা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য। তারা একে কিয়াসের উপর অগ্রাধিকার দেন। ফলে ইজতিহাদ বিভিন্ন রকম হয়েছে। যেমন–

বিবাহে কুফুর/(সমতা) শর্ত আরোপে ফকীহদের মতভেদ। জমহুরের মতে বিবাহে কুফু থাকা শর্ত। কারণ এ সংক্রান্ত হাদীস। যেমন–

الا لايزوج النساء إلا الاولياء ولايزوجن إلا من الا كفاء -

"নারীদেরকে অভিভাবক ছাড়া অন্য কেউ বিবাহ দিবে না তাদেরকে কুফু বা সমতা রক্ষা না করে বিবাহ দিবে না"।[২২]

মালেকীগণ এই হাদীসটি গ্রহণ করেননি। কেননা তাদের মতে, এর প্রথম রাবী মুবাশশির ইবনে উবাইদের ব্যাপারে মিথ্যাবাদিতার অভিযোগ রয়েছে এবং দ্বিতীয় রাবী হাজ্জায ইবনে আরতা বিতর্কিত ব্যক্তি। তৃতীয়তঃ দুর্বল না হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন হাদীসের বিধান নিয়ে মতভেদ এর কয়েকটি কারণ রয়েছে।

এক. হাদীসের শব্দ ভিন্নতা

একই বিষয়ে বিভিন্ন হাদীসের ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূল স. বলেছেন :

من صلى على جنازة فى المسجد فلا شئ له -

'যে ব্যক্তি মসজিদে জানাযা পড়বে তার জন্য কোন সওয়াব নেই।' অন্য বর্ণনামতে فلا شئ عليه 'তার কোন অপরাধ হবে না।'[২৩]

তাই প্রথম বর্ণনাকে সহীহ ধরে নিয়ে হানাফীগণ বলেন, মসজিদে জানাযার পড়া অপছন্দনীয়। অন্যদিকে দ্বিতীয় বর্ণনাকে সহীহ মনে করে শাফেঈগণ বলেছেন, মসজিদে জানাযা পড়া জায়েয, অপছন্দনীয় নয়।

রসূলুল্লাহ স. এর বাণী ذكاة الجنين ذكاة امه হাদীসে উল্লেখিত ذكاة শব্দে 'রফা' দিয়ে ইমাম শাফেঈ বলেন, গর্ভস্থিত পশুর মাকে জবেহ করলেই তা খাওয়া হালাল। কেননা হাদীসের অর্থ হলো, গর্ভস্থিত পশুর মাকে জবেহ করাই তাকে জবেহ করার স্থলাভিষিক্ত। আর ذكاة শব্দ নসব দিয়ে পড়লে অর্থ হবে গর্ভস্থিত পশুকে তার মায়ের মতোই জবেহ করতে হবে। এই হিসাবে হানাফীগণ বলেন, পশু জবেহ করার পর পেটে বাচ্চা পাওয়া গেলে সেটি খাওয়ার জন্য নতুন করে জবেহ করতে হবে।[২৪]

দুই. বর্ণনাকারী তার বর্ণনার বিপরীত আমল করা

ইমাম আবু হানিফা বর্ণনাকারীর রেওয়ায়েতের তুলনায় তার আমলের উপরই বেশি নির্ভর করতেন। কেননা রাবী যদি তার বর্ণনা বিপরীত আমল করেন এবং তার আমল যদি সঠিক হয় সেক্ষেত্রে তার বর্ণিত রেওয়ায়েত অকার্যকর হয়ে যাবে। অন্যদিকে জমহুর ফকীহগণের মতে, রাবী কখনো কখনো ব্যক্তিগত ইজতিহাদের ভিত্তিতে তার বর্ণনার বিপরীত আমল করতেই পারেন। তাই আমল ধর্তব্য নয়। এই নীতির ভিত্তিতে হানাফী মাযহাব রুকুতে ওঠা-নামার সময় দু'হাত উত্তোলন সমর্থন করেননি। কেননা সংশ্লিষ্ট হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনে উমর রা. এরূপ আমল করতেন না।

তিন. হাদীসের এমন শব্দ ছুটে যাওয়া যা ব্যতীত বক্তব্য বুঝা যায় না

দৃষ্টান্ত-১

'লাইলাতুল জিন' এর ঘটনা প্রসংগে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর একটি হাদীস ماشهد ها منا أحد 'আমাদের কেউ তা দেখেনি।' অথচ মূল হাদীসটি ছিল ما شهد ها منا أحد غيرى অর্থাৎ 'আমি ছাড়া আমাদের কেউ তা দেখেনি'। রাবী হয়ত

ভুলবশতঃ غيرى শব্দটি ছেড়ে দিয়েছিরেন। সুতরাং যে মুজতাহিদ অতিরিক্ত শব্দটি পাননি, তিনি হাদীসের সঠিক বক্তব্য বুঝবেন না।

দৃষ্টান্ত-২

ان يكن الشؤم ففى ثلاث : الدار والمرأة والفرس -

'তিনটি বিষয়ে অশুভ লক্ষণ রয়েছে বাড়ি, নারী ও ঘোড়া।'

এমতাবস্থায় হাদীসটি অন্য একটি সহীহ হাদীস (... لاعدوى) এর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। অতঃপর এ বিষয়ে আয়েশা রা. বলেন, প্রথম হাদীসটির বাদ পড়া অংশ হলো,

اهل الباهلية يقولون ....

অর্থাৎ 'জাহেলী যুগের লোকেরা বলতো: তিনটি বিষয়ে অশুভ লক্ষণ রয়েছে: বাড়ি, নারী ও ঘোড়া।'

চার. হাদীসের সঠিক উদ্দেশ্য আয়ত্ত না করায় পার্থক্য কখনো কখনো রসূলুল্লাহ স. এর বক্তব্যের যথার্থ উদ্দেশ্য সকলে সমভাবে আয়ত্ত না করায় মতামত প্রদানে সাময়িক পার্থক্য তৈরী হয়েছে।

দৃষ্টান্ত-৩

ইবনে উমর রা. এর একটি হাদীস। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : 'মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজন কান্নাকাটি করলে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেয়া হয়।' এ বক্তব্য শুনে আয়েশা রা. বললেন, এটা ইবনে উমরের ধারণা প্রসূত কথা। রসূলুল্লাহ স. এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য ও স্থানকাল তিনি আয়ত্ত করে রাখেননি। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, একবার রসূলুল্লাহ স. জনৈক ইহুদী মহিলার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে দেখলেন, মৃতের আপনজনেরা তার জন্য মাতম করছে। তিনি তখন বললেন : 'এরা এখানে তার জন্য কান্নাকাটি করছে, অথচ কবরে তার আযাব হচ্ছে।'

ইবনে উমর রা. মনে করেছিলেন, কান্নাকাটির কারণে মৃতের আযাব হয়েছে এবং বিষয়টি সাধারণভাবে সকল মৃতের জন্য প্রযোজ্য। অথচ রসূলুল্লাহ স. এর বক্তব্য ছিল উক্ত ইহুদী মহিলার জন্য নির্দিষ্ট এবং তিনি কান্নাকাটিকে আযাবের কারণ হিসাবে উল্লেখ করেননি। উল্লেখিত হাদীসটি সহীহ হওয়া সত্ত্বেও সঠিক উদ্দেশ্য অনুধাবন না করায় মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।[২৫]

পাঁচ. প্রেক্ষাপট উল্লেখ না করে হাদীস বর্ণনা করা যেমন উরায়না গোত্রের অভিযুক্তদের হাত-পা কেটে দেয়া ও চক্ষু উপড়ে ফেলার নির্দেশ সম্বলিত নবী করীম

স. এর হাদীস। এটি বর্ণনাকালে রাবী প্রেক্ষাপট উল্লেখ না করায় 'অংগচ্ছেদ নিষেধ' সংক্রান্ত অন্য একটি হাদীসের সাথে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।
মূলত হাদীসটির প্রেক্ষাপট হলো উরায়না কিছু রাখালের অংগচ্ছেদ করায় তাদেরও অংগচ্ছেদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ছয়. খবরে আহাদের উপর আমল করা নিয়ে মতভেদ

কোন সহীহ্ হাদীসের রাবী সংখ্যা যেকোনো পর্যায়ে একজন হয়ে গেলে তাকে খবরে আহাদ বলে। খবরে আহাদের উপর আমল করা নিয়ে ফকীহ্গণের আরোপিত শর্তাবলী বিভিন্ন রকম। তাই একটি খবরে আহাদ কোনো মুজতাহিদ তার শর্তের ভিত্তিতে গ্রহণ করলেও দেখা গেছে অন্য জন তার শর্তের ভিত্তিতে সেটি গ্রহণ করেননি। ফলে উভয়ের ইজতিহাদ একই রকম হয়নি।

ভাষা ও উসূলের মূলনীতি বিষয়ক মতপার্থক্য এ জাতীয় ইখতিলাফের দু'টি উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

প্রথমতঃ মুতলাক ও মুক্বাইয়্যাদ বিষয়ক মতভেদ একই বিষয়ে দু'টি নস এর উপর অর্পণ করা হবে। অর্থাৎ মুকাইয়্যাদ অনুযায়ী আমল হবে। হানাফীগণ বলেন, প্রতিটি নসকে আলাদা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

দৃষ্টান্ত-১

আল্লাহ তা'আলার বাণী: (মুকায়্যাদ)

ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة -

'কেউ কোন মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করলে এক মু'মিন দাস মুক্ত করবে।'[২৬]

অন্যত্র (মুতলাক) আয়াতে আল্লাহ বলেন,

والذين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا

'যারা নিজেদের স্ত্রীগণের সাথে যিহার করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তবে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করতে হবে।'[২৭]

উপরোক্ত আয়াত দু'টির প্রথমটি ভুলবশত হত্যা ও দ্বিতীয়টি স্ত্রীর সাথে যিহার সংক্রান্ত। উভয় আয়াতের বিধান হলো একটি দাস মুক্ত করা। তবে প্রথম আয়াতে দাসকে মু'মিন হতে হবে।' অন্যদিকে হানাফীদের মতে, শুধু হত্যার কাফ্ফারার ক্ষেত্রে দাসের ঈমান থাকা শর্ত, যিহারের ক্ষেত্রে নয়। কেননা কারণের ভিন্নতার

কারণে সিফাতেও ভিন্নতা আসে। তাই হত্যার কাফ্ফারায় কঠোরতা প্রযোজ্য। কিন্তু যিহারের কাফ্ফারায় অনুরূপ কঠোরতা না থাকাই স্বাভাবিক।

দৃষ্টান্ত-২

সর্বোচ্চ কতজন নারী একটি শিশুকে দুধ পান করাতে পারে এ নিয়ে মতভেদ। শাফেঈদের মতে, পাঁচজন। হানাফীদের মতে, এ সংখ্যা অনির্ধারিত।

হানাফীদের দলীল- وأمهاتكم اللاتى ارضعنكم 'তোমাদের দুধমাতাগণ' আয়াতটি মুতলাক বা শর্তহীন। এছাড়াও সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত নবী স. এর হাদীস–

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب -

'নসব বা আত্মীয়তার কারণে যা হারাম স্তন্যদানের ফলেও তা হারাম হয়।' শাফেঈদের দলীল হচ্ছে আয়েশা রা. এর একটি হাদীস, যেখানে দুগ্ধদানকারিণীর সংখ্যা নির্ধারিত আছে। তারা মুকায়্যাদকে মুতলাকের উপর অগ্রাধিকার দেন।

হানাফীগণের মতে, 'আম খাসের মতো অকাট্য দলীল। সংখ্যাগরিষ্ঠ উসূলবিদগণ মনে করেন, 'আম দ্ব্যর্থহীনভাবে কোন কিছু প্রমাণ করে না। 'আম এর উদ্দেশ্য পরিষ্কার হওয়ার জন্য অন্য দলীলের প্রয়োজন হয়। 'আম ও খাসের পৃথক দৃষ্টিভংগির কারণে অসংখ্য মাসআলায় মতভেদ হয়েছে।

দৃষ্টান্ত-৩

মুসলমান কর্তৃক পশু জবাই করার ক্ষেত্রে আল্লাহর নাম স্মরণ না করলে গোশত খাওয়ার বিধান নিয়ে মতভেদ। হানাফী মাযহাবের মতে, পশু জবাই করার ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত যে-কোনোভাবেই আল্লাহর নাম স্মরণ না করলে উক্ত পশুর গোশত খাওয়া হারাম। তারা বলেন, কেননা নিম্নোক্ত আয়াতটি 'আম তথা ব্যাপকার্থক।

ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه -

'যাতে আল্লাহর নাম লওয়া হয়নি তার কিছুই তোমরা আহার করো না।'[২৮]

জমহুর আলিমের মতে, কোনো মুসলমান পশু জবাই করার সময় ভুলবশত বিসমিল্লাহ না বললেও তার গোশত খাওয়া জায়েয। কেননা রসূলুল্লাহ স. সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন,

ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها او لم يذكر -

'বিসমিল্লাহ উল্লেখ করা হোক বা না হোক মুসলমান কর্তৃক যবাইকৃত জন্তু খাওয়া হালাল।'

উপসংহার

পরিশেষে আমরা বুঝতে পারলাম, শরীয়তের কিছু আনুষঙ্গিক বিষয়ে ইজতিহাদের সুযোগের পাশাপাশি মতভেদ করারও সুযোগ রয়েছে। আর এ মতপার্থক্য একদিক থেকে যেমন অস্বাভাবিক নয় অন্যদিকে শর্তহীন বা অবারিতও নয়। কুরআন সুন্নাহর আলোকে সত্যনিষ্ঠভাবে ইজতিহাদ করলে যদি ভুলও হয় তবুও রাসূলুল্লাহ স. একটি সাওয়াবের ঘোষণা করেছেন। শুদ্ধ হলে দু'টি সাওয়াবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। ইসলাম যেহেতু গতিশীল জীবন বিধান তাই নতুন নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত রাখা উচিত।

তথ্যনির্দেশ

১. *আল-মাউসূয়াতুল ফিকহিয়্যা*, কুয়েত সরকারের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০০৭, খ. ১, পৃ. ১৫
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
৩. বা'লাবাক্কী, ড. রুহী, *আল মাওরিদ*, বৈরূত : দারুল ইলম, ২০০৫, পৃ. ১০১২
৪. তালিব, আব্দুল মান্নান, সম্পাদকীয়, *ইসলামী আইন ও বিচার*, সংখ্যা-১৯, ৭,পৃ.৪
৫. মুস্তফা. ড. *আসবাবু ইখতিলাফিল ফুকাহা*, কায়রোঃ দারুন নশর, ১৯৮৯, পৃ. ৩২-৩৫
৬. আকলা, ড. মুহাম্মদ, *দিরাসাতু ফিল ফিকহিল মুকারিন*, জর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ঃ মাকতাবাতুর রিসালাহ, ১৯৮৩,পৃ, ১১
৭. মুস্তফা, ড., *আসবাবু ইখতিলাফিল ফুকাহা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৯
৮. হাসান, ড. হোসাইন হামেদ, *আল-মাদখাল লি দিরাসাতিল ফিকহিল ইসলামী*, জর্দানঃ আল মা'রিফা, ২০০০, পৃ. ৬০-১৫৮
৯. ড. যাহরা, আবু, *তারিখুল মাযাহিব আল-ইসলামিয়্যা*, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৫, খ. ২. পৃ. ২১৪-২২০
১০. আকলা, ড. মুহাম্মদ, *দিরাসাত ফিল ফিকহিল মুকারিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
১১. আল কুরআন, ১:২২৮
১২. ইবনে মানজুর, *লিসানুল আরব*, আল-কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০৩, পৃ. ৩৩৫; রহমান, ড. মুহাম্মদ ফজলুর, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, পৃ. ২০৮
১৩. হাসান, ড. হোসাইন হামেদ,*আল-মাদখাল ইলাল ফিকহিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৮

১৪. আল কুরআন, ১:২৮২

১৫. আল কুরআন, ৬২:৯

১৬. তোহা, ড., *দিরাসাতুল ফিল ইখতিলাফাত আল ফিকহিয়্যা.* বৈরূতঃ মাকতাবাতুর রিসালাহ. ১৯৮৫. পৃ.৫৫

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫

১৯. সুয়ূতী, ইমাম, *আল জামেউস সগীর,* আল-কাহেরা : মাকতাবুল হাদীস, ১৯৭১, খ. ২, পৃ.১৯২

২০. প্রাগুক্ত, খ. ১, ২২

২১. তোহা, ড. *দিরাসাতু ফিল ইখতিলাফাত আল-ফিকহিয়্যা,* প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮

২২. শাওকানী, *কাওয়ায়েদুল মাজমুআ ফিল আহাদীস আল মাওদুআ,* আল-কাহেরা : দারুন নশর, ১৯৯৫, পৃ. ১২৪

২৩. সুয়ূতী, ইমাম, *আল জামেউস সগীর,* প্রাগুক্ত, খ. ২,পৃ.১৭৫

২৪. আকলা, ড. মুহাম্মদ, *দিরাসাতু ফিল ফিকহিল মুকারিন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

২৫. আকলা, ড. মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

২৬. আল কুরআন, ৪:৯২

২৭. আল কুরআন, ৫৮:৩

২৮. আল কুরআন, ৬:১২১

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ ৭, সংখ্যা ২৫
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১১

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী অধিকার : আইনী প্রতিকারের সফলতা ও ব্যর্থতা

নাহিদ ফেরদৌসী*

[সারসংক্ষেপ : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশসমূহের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ শতাংশ মানুষ কোন না কোনভাবে প্রতিবন্ধী। তবে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে এই হার আরো বেশি। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর অন্যতম। এ দেশের প্রায় দেড় কোটি মানুষ প্রতিবন্ধী অবস্থায় জীবন যাপন করে। প্রতিবন্ধী বা ব্যতিক্রমধর্মী এসব ব্যক্তি শিশুকাল থেকে শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার কারণে অন্যান্যদের থেকে আলাদা বিবেচিত হয়। প্রতিবন্ধিতার কারণে প্রতিবন্ধীরা বিদ্যমান নাগরিক অধিকার ও সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত। তাই এসব শিশুর পেছনে বেশির ভাগ পরিবার শ্রম, মেধা ও অর্থ বিনিয়োগ করতেও আগ্রহী হয়ে ওঠে না। প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুর্নবাসনের যে সীমিত ব্যবস্থা দেশে চালু রয়েছে তাও প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি, শিক্ষা উপকরণ ও অন্যান্য সহায়ক সেবা এবং পিতামাতা ও সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের অভাবে সুফল বয়ে আনতে পারছে না। প্রতিবন্ধীদের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদরূপে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উদ্যোগেরও অভাব রয়েছে। তাই প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, কীভাবে প্রতিবন্ধীদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা যায়।]

প্রতিবন্ধী

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা আইন (খসড়া), ২০১০ এর ২ ধারায় 'প্রতিবন্ধিতা' বলতে যে কোন কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ীভাবে কোন ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক বা বুদ্ধিগত বা বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্থতা বা প্রতিকূলতা, এবং উক্ত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিবেশগত বাধার পারস্পরিক প্রভাবকে বুঝাইবে, যার কারণে উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ বাধাপ্রাপ্ত হন। পাশাপাশি তফসিল 'ক' এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের শারীরিক

---

* সহকারী অধ্যাপক (আইন), এসএসএইচএল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

বা মানসিক বা বুদ্ধিগত বা বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্থতা বা প্রতিকুলতা'র ভিন্নতা বিবেচনা করিয়া বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, শারীরিক (চলন) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, অটিজম সম্পন্ন ব্যক্তি দীর্ঘস্থায়ী মানসিক অসুস্থতা জনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে ভাগ করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধীদের অধিকারসমূহ :

১. মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি ও প্রয়োগ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে দেশের সকল নাগরিকের জন্য যেসকল মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি ও নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে, প্রতিবন্ধী নাগরিকদের ক্ষেত্রে ঐসকল মৌলিক অধিকার সমতার ভিত্তিতে ভোগ করার অধিকার থাকতে হবে এবং তা লংঘিত হলে তারা সংবিধানিক প্রক্রিয়ায় তা বলবৎ করারও অধিকারী হবে।

২. শিক্ষার অধিকার : প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্যান্য সাধারণ শিশুর মতই শিক্ষা গ্রহণের অধিকার রয়েছে। প্রতিবন্ধিত্ব নিরূপণের মাধ্যমে প্রত্যেকের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অনেকের ধারণা, প্রতিবন্ধী শিশুরা সাধারণ শিশুদের ন্যায় শিক্ষা গ্রহণে অক্ষম। কিন্তু এটি পরীক্ষিত যে, প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে অধিকাংশ শিশু সাধারণ শিশুদের সাথে সমভাবে শিক্ষা গ্রহণে সামর্থ্যবান। একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধী শিশুদের এক বিশাল অংশ সাধারণ শিক্ষার আওতায় আসতে পারে এবং শিক্ষার মৌলিক অধিকার লাভে সহায়তা পেতে পারে। তবে গুরুতর প্রতিবন্ধিতার ক্ষেত্রে বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব। প্রতিবন্ধীত্বের শ্রেণী, ধরণ, প্রভাব, কারণ, সক্ষমতা ও পারিবারিক পরিবেশ অনুযায়ী তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। তবে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজ সেবা অধিদফতরের ওপর ন্যস্ত। প্রচলিত আইন ও বিভিন্ন ধরনের নীতিমালার ভিত্তিতে তারা এসব শিশুর শিক্ষার বিষয়টি পরিচালনা করছে। প্রতিবন্ধী শিশু ও কিশোরদের শিক্ষা লাভের সহায়তায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী এসব শিশুর উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি প্রবর্তন করেছে। এক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত কোন ধরণের শিক্ষা কর্মসূচিতে এসব শিশুরা অংশগ্রহণ করতে পারে না। এমনিতেই তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম

থাকে, তার ওপর তাদের সাধারণ শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় না এনে ভিন্ন ধরনের নাম মাত্র শিক্ষা ব্যবস্থায় এনে আরো অক্ষমতায় পরিণত করা হয়। অথচ শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত প্রতিবন্ধী শিশু সংখ্যা প্রায় ১৬ লাখ। এসব শিশুর জন্য সরকারি পর্যায়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত এসব প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অত্যল্প। এসবের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিক্ষা কর্মসূচিসহ বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। অধিদপ্তরের আওতায় এসব শিশুর জন্য শিক্ষা কার্যক্রমসমূহ হলো–

(১) সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম- ৬৪ জেলার জন্য ৬৪টি স্কুলের সাথে সম্পৃক্ত। প্রতি জেলায় একটি সাধারণ স্কুলে ১০/১৫ টি আসন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য রাখা হয়। সাধারণ শিক্ষার সাথে ব্রেইল পদ্ধতিতে এসব শিশুরা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে;

(২) মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য চট্টগ্রামে ১টি প্রতিষ্ঠান;

(৩) দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- সারা দেশে ৫টি;

(৪) শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- সারা দেশে ৭টি;

(৫) প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ব্রেইল প্রেস- সারা দেশে ১টি;

(৬) কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র টঙ্গীতে ১টি। প্রতিবন্ধী শিশুরা এখান থেকে কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং সাধারণ শিক্ষক কাজ করে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুরা এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ সম্পূর্ণ পৃথক এবং অনগ্রসর।

অন্যদিকে এসব শিশুর স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবন গঠনের জন্য বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন এনজিও কাজ করে যাচ্ছে, তবে সেটি শুধু শহর ভিত্তিক। এনজিও পরিচালিত এসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা সংস্থা স্থানীয় পর্যায়ে এসব শিশুদের সেবা দিতে অক্ষম। ফলে বেসরকারী প্রতিবন্ধী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সাধারণত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুদের সুযোগ থাকে না। কারণ এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার বহনের সামর্থ্য এ ধরনের পরিবারের থাকে না। শুধু উচ্চবিত্ত পরিবারের এবং শহরের শিশুর এতে সুযোগ পেয়ে থাকে। বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রায় ২০টি, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য প্রায় ৪টি, অটিস্টিকদের জন্য প্রায় ৬টি এবং বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীদের জন্য প্রায় ৫০ টির মতো স্কুল আছে।[১]

দেশে প্রচলিত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিবন্ধী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতি বছর কতজন প্রতিবন্ধী শিশু শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে তার কোনো পরিসংখ্যান নেই। প্রতি বছর বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেয়া হলেও প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার জন্য কোন বরাদ্দ থাকে দেখা যায় না। কোন শিক্ষার অধিকারের ঘোষণায় আলাদাভাবে প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষার বিষয়টি তুলে ধরা হয় না। তাদের শিক্ষার বিষয়টি পুরোপুরিভাবে সমাজকল্যাণের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে প্রতি বছর হাজার হাজার প্রতিবন্ধী শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যদিও বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা, ১৯৯৫ প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য ছিল "সকলের পূর্ণ অংশগ্রহণ ও সমসুযোগে নিশ্চিতকরণ যা বাংলাদেশের সংবিধানে এবং প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত রচিত আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত এবং ঘোষণাসমূহ বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছে"। বাস্তবে এর কোন প্রতিফলন ঘটেনি।

৩.তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের অধিকার : প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আছে তথ্য ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি বড় অংশ দরিদ্র অবহেলিত। ভয়, কুসংস্কার ও অজ্ঞতা তাদের দারিদ্র থেকে মুক্তির অন্যতম প্রধান বাধাঁ। এছাড়া আমাদের রাস্তা-ঘাট, ইমারত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলাচল উপযোগিতার অভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও আত্মউন্নয়নের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। যথাযথ নীতি, উদ্যোগ ও সামাজিক বাঁধা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আলাদা করে রেখেছে উন্নয়নের মূল ধারা, আধুনিক সুযোগ সুবিধা ও তথ্য প্রযুক্তি থেকে। আমাদের দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য তথ্য ও তথ্য প্রযুক্তি এখনো সহজলভ্য নয়।[২]

১৯৯৩ সালে গৃহীত জাতিসংঘের ষ্ট্যাণ্ডার্ড রুলস এর ৫ নং ধারায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্যের প্রাপ্তির অধিকার সর্ম্পকে যা বলা হয়েছে তা হলো-

"সর্বক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অথবা তার পরিবারের অধিকার রয়েছে সেবা, অধিকার, প্রতিবন্ধিতা নির্ণয় ও তাদের জন্য গৃহীত কর্মসূচী সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার। এসব তথ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য উপযোগী করে পরিবেশন করতে হবে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ তাদের উপযোগী করে পরিবেশন করার। ব্রেইল, টেপ, বড় অক্ষরে ছাপা ও অন্যান্য উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে লিখিত ডকুমেন্ট প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য।"

৪. প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান : বাংলাদেশে প্রায় ৬৩টি সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসংস্থান সেবা দিয়ে আসছে। সমাজ সেবা অধিদপ্তর ২টি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। সেখানে কাঠের কাজ, কৃষি খামার, যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও মেরামতের কাজ, দর্জি কাজ ইত্যাদি দক্ষতার উপর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে স্ব-কর্মসংস্থান করার মতো আর্থিক সাহায্য করা হয়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৯৮ সাল থেকে সমাজসেবা অধিদপ্তর জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনা করে আসছে।[৩] কিন্তু আর্থিক সহায়তা অত্যন্ত সীমিত এবং প্রশিক্ষণ উপকরণসমূহ অনেক পুরানো।

৫.স্বাস্থ্যসেবা : প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মানবাধিকার, আত্মমর্যাদা, স্বাধিকার এবং বিশেষ চাহিদা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করে তাদের যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা দিতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের স্বাস্থ্য বীমা ও জীবন বীমারও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তবেই এক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য অনেকটা দূর হতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্যজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ প্রযোজ্য অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসা খরচ সরকারিভাবে বহনের ব্যবস্থা করা উচিত।

৬. মুক্ত চলাচল ও প্রবেশগম্যতা : প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ স্বাধীনভাবে জীবনযাপন এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ণ ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের অধিকারী হবে। 'মুক্ত চলাচল' অর্থাৎ রাস্তাঘাট, ফুটপাথ, ফুট-ওভারপাথ, সাধারণ পরিবহণ ও যানবাহনসমূহ, ভবন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আদালত, হাসপাতাল, থানা, রেল স্টেশন, বাস টার্মিনাল, লঞ্চ টার্মিনাল, বিমান বন্দর, গ্রন্থাগার, গণশৌচাগার, দূর্যোগকালীণ আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্থান, বিনোদন ও খেলাধুলার স্থান, দর্শনীয় স্থান ও পর্যটন কেন্দ্র, পার্ক এবং জনগণের নিয়মিত যাতায়াতের সকল স্থান প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহারোপযোগী করার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের মত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও নিজে নিজে সব জায়গায় চলাচলের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তথ্য, যোগাযোগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, চিকিৎসা সেবা, ব্যাংকিং সেবা এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেন সহজে দেশীয় বিভিন্ন মুদ্রার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে সে ধরনের কার্যকর কোন উন্নত ব্যবস্থা ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই।

৭. সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণ : প্রতিবন্ধী শিশুরা স্কুল-ভিত্তিক নিয়মিত কর্মকাণ্ডসহ সাধারণ খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিনোদন, অবকাশ ও

ক্রীড়ামূলক কর্মকাণ্ডে সমান অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সৃজনশীল, শিল্পীসুলভ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্ভাবনা এবং শারীরিক বিকাশ ও তা ব্যবহারের সুযোগ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে মূলধারার সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও খেলাধুলায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ এবং প্রতিবন্ধিতা উপযোগী খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড আয়োজন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী।

৮. সমাজ ভিত্তিক পুনর্বাসনের অধিকার : আমাদের দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের নিজেদের ও তাদের পরিবারের পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান এবং জীবনযাপনের সন্তোষজনক মান ও ক্রমাগত উন্নয়ন নিশ্চিত করার কোন বাস্তব উপযোগী কার্যকর ব্যবস্থা নেই। সরকারের সকল সামাজিক সুরক্ষামূলক ও দারিদ্র্য দূরীকরণমূলক কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী নারী, শিশু এবং প্রবীণদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকলেও তা বাস্তবায়ন করা হয় না। বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংগঠন সমাজভিত্তিক পুনর্বাসনের কার্যক্রম ও প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে ৩টি সরকারি ও ১৬৫টির মতো বেসরকারি সংগঠন সরাসরি পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তবে প্রতিবন্ধী জনসংখ্যার তুলনায় তা মোটেও পর্যাপ্ত নয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বিষয়ে আইনগত বিধান

১.সাংবিধানিক বিধান : বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের শিক্ষা লাভের সুযোগ একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। সংবিধানে সকল নাগরিকের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা, কর্মের অধিকার এবং সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তার বিধান করেছে। সংবিধানের ১৫,১৭,২০ এবং ২৯ অনুচ্ছেদে অন্যান্য নাগরিকের সাথে প্রতিবন্ধীদের সমান সুযোগ ও অধিকার প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১৫ এ উল্লেখ রয়েছে যে, রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়। সংবিধানের ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে যে, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ পরিস্থিতিজনিত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার রয়েছে।[৪]

১৭ অনুচেছদে উল্লেখ আছে, রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল শিশুকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য, সমাজের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য, আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।[৫]

অনুচ্ছেদ ২০ এ বলা হয়েছে, কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয় এবং "প্রত্যেকের কাছ থেকে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী"- এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকেই স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন। রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবি কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধি, বৃত্তিমূলক ও কায়িকসহ সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে। এছাড়া ২৯ অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে বলে সংবিধানে উল্লেখ আছে। এভাবে সংবিধানে সামগ্রিকভাবে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও সম-অধিকার এর নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। এমনকি ১৭ নং অনুচ্ছেদে উক্ত বিষয়ে রাষ্ট্রের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। সাংবিধানিক এই সকল আইনগত ভিত্তি ও নিশ্চয়তার পরও দারিদ্র, অব্যবস্থা এবং বিবিধ কারণে বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

২.প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা : বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা প্রনয়ণের মূল উপাদান হচ্ছে"সকলের পূর্ণ অংশগ্রহণ ও সমসুযোগ নিশ্চিতকরণ" যা বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লেখ আছে এবং প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত রচিত আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত ও ঘোষণাসমূহ যা বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছে। ১৯৯৫ সালের পূর্বে সরকারিভাবে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী বিষয়ক কোনো নীতিমালা ছিল না। প্রতিবন্ধীদের জীবন-যাপন, শিক্ষা, জীবনমান উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে কোন সমন্বয়ও ছিল না। ফলে প্রতিবন্ধীদের বিষয়টি রাষ্ট্রীয় এবং সরকারিভাবে খুবই উপেক্ষিত ও অবহেলিত অবস্থায় ছিল। সাধারণ জনসাধারণের মধ্যে এটি ছিল একটি অজানা বিষয়। জনসাধারণের মধ্যে বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলার এবং প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। ফলে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিশুর অধিকার বিষয়ক 'প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা, ১৯৯৫' প্রণয়ন করা হয়। নীতিমালাতে

বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক দিক নির্দেশনার রূপরেখা দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ, সনাক্তকরণ, শিক্ষা, পুনর্বাসন, গবেষণা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন জাতীয় কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এছাড়া জাতীয় শিক্ষা নীতি কমিটি ১৯৯৭ এর প্রতিবেদনে প্রতিবন্ধীদের বিশেষ শিক্ষা বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দরিদ্র, অসহায়, সুবিধা বঞ্চিত প্রতিবন্ধী শিশু কিশোরদের শিক্ষা লাভের সহায়তা হিসেবে ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছর থেকে প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা করা হয়। বাংলাদেশের সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই কর্মসূচির আওতায় রয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে এই কর্মসূচি শক্তিশালী ও যুগোপযোগী পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান কমিটির অভাবে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সফল বাস্তবায়ন হয়নি।

৩. জাতীয় শিশুনীতিতে প্রতিবন্ধী শিশুর অধিকার : বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি, ১৯৯৪ সংবিধানের মৌলিক নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে এবং জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের উপর ভিত্তি করে শিশুদের নিরাপত্তা, কল্যাণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ৬টি প্রধান লক্ষ্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, যে সকল শিশু শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা, চিকিৎসা, আশ্রয়, যত্ন, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। শৈশবকালীন প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচি বিশেষ করে টিকাদানের মাধ্যমে পোলিও, মাইলাটিস, আয়োডিন বা ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত পঙ্গুত্ব নির্মূলকল্পে কর্মসূচির গ্রহণ করতে হবে।

৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা আইন : প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণ ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে 'প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১' প্রণয়ন করা হয়। এরপর ২০০৯ সালে প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ সংশোধন করা হয়। এসব আইনে তাদের অধিকারের পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদার বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু শিক্ষার বিষয়টি সাধারণ শিশুদের থেকে পৃথক করায় এটি প্রমাণিত হয় তাদেরকে ভিন্ন সত্তা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা আইন, ২০১০ (খসড়া) দ্বারা বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ রহিত করা হয়। নতুন এই আইন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিধান করার লক্ষে প্রণীত হয়। এই আইনের ৫০ ধারা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা নেতিবাচক প্রভাব বৈষম্য ও অপরাধ

হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং তা দণ্ডনীয়। নিম্নলিখিত বাঁধা, বৈষম্য বা নেতিবাচক প্রভাব অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হইবে-

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার কারণে অযোগ্য বিবেচিত করলে।
- পারিবারিক পর্যায়ে কোন ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধিতার কারণে অবহেলা করলে কিংবা অবহেলার কারণে কোন ব্যক্তি প্রতিবন্ধিতার শিকার হলে।
- অত্যাচার বা নির্যাতনের শিকার কোন ব্যক্তি আইনের আশ্রয় নিতে চাইলে প্রতিবন্ধিতার কারণে তা অগ্রাহ্য হিসেবে বিবেচিত হলে।
- রাষ্ট্রীয়, স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক সেবা ও সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন ব্যক্তিকে উক্ত সেবা ও সুবিধা থেকে বঞ্চিত করলে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের স্বার্থের পরিপন্থী যে কোন কার্যক্রম, পদক্ষেপ গ্রহণ বা চেষ্টা করলে।
- প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন অভিভাবক তাঁর পোষ্য শিশু বা ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করলে বা করার চেষ্টা করলে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি সংগঠিত মীমাংসার অযোগ্য কোন আমলযোগ্য অপরাধ মীমাংসা করলে কিংবা আইনের আশ্রয় লাভের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করলে, চেষ্টা করলে বা প্রভাব বিস্তার করলে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কোন সাধারণ যানে আরোহণের ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি করলে।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের সুস্থ শরীরিক ও মানবিক বিকাশের ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করলে।
- কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোন চাকুরীপ্রার্থীকে প্রতিবন্ধিতার কারণে অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত করা হলে।
- উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার কারণে কাউকে বঞ্চিত করা হলে, কম দিলে কিংবা এর চেষ্টা করলে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কোন সম্পদ আত্মসাৎ বা গ্রাস করলে বা গ্রাস করার চেষ্টা করলে।
- কোন সরকারি স্থাপনা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আরোহণের উপযোগী করে না করলে; এক্ষেত্রে নকশা প্রণয়নকারী এবং অনুমোদনকারী ব্যক্তি দায়ী হবেন।
- প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়াসহ কোন মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত করলে।

- পাঠ্য পুস্তকসহ যে কোন প্রকাশনা এবং গণমাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে নেতিবাচক, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর ধারণা প্রদান করলে বা নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার করলে।

৫১ ধারা মোতাবেক এই আইনের অধীনে সংগঠিত অপরাধের বিচার প্রক্রিয়ায় ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধির ২০ ধারা প্রযোজ্য হবে। প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বিচার করবে এবং এর নীচের কোন আদালত বিচার করতে পারবে না। এই আইনের মতে আমলযোগ্য অপরাধের জন্য, অপরাধী ব্যক্তিকে যে কোন প্রকার দণ্ড প্রদান প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য আইন সঙ্গত হবে। এবং এই আইনের অধীনে সংগঠিত যে কোন অপরাধ আমলযোগ্য, মীমাংসাযোগ্য এবং জামিন অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। ৫২ ধারানুযায়ী কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বৈষম্যের শিকার হলে বৈষম্য সৃষ্টিকারী ব্যক্তি ৩ বৎসরের নীচে নয় এমন মেয়াদের কারাদণ্ড বা এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবে।

৫. আন্তর্জাতিক আইনে প্রতিবন্ধীর অধিকার ও কার্যক্রম : ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ মানবাধিকারের যে সার্বজনীন ঘোষণাপত্র গ্রহণ ও জারি করে (Universal Declaration of Human Rights), সেটি ছিল মানবাধিকার দলিল। এই দলিলে সকল মানুষের সম-মর্যাদা ও সম-অধিকারের ঘোষণা করা হয়েছে। সমগ্র মানব সমাজের অংশ হিসেবে প্রতিবন্ধী জনগণ অবশ্যই এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। এই দলিলের সূত্র ধরেই পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে মানবাধিকারের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জাতিসংঘ দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের প্রতিই প্রথম জাতিসংঘের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে "Declaration on the Rights of Mentally Retarded Person" ঘোষণা করা হয়।[৬] এছাড়া জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯ এর ২৩ অনুচ্ছেদে প্রতিবন্ধী শিশুর সংজ্ঞা এবং রাষ্ট্রকে এসব শিশুর মর্যাদা নিশ্চিত করে, আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ও সমাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুবিধা প্রদান করে পূর্ণাঙ্গ ও সুন্দর জীবনযাপনের অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে বলা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য সুবিধাদি, নীতিমালা ও কর্মসূচি শিশু অধিকার কনভেনশনের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে, এমনকি উন্নয়নশীল দেশসমূহের তুলনায়, খুবই অপর্যাপ্ত।[৭]

প্রতিবন্ধী বিষয়ে যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সম্পর্কে জাতিসংঘের বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবন্ধীত্বের সংজ্ঞা নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘের নিম্নোক্ত দলিলসমূহকে এবং এশিয় প্রশান্তমহাসাগরীয়

অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কমিশন "এসকাপের" প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকাণ্ড উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ক) প্রতিবন্ধী বিষয়ক বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা ও প্রতিবন্ধী দশক
(খ) শিশু অধিকার সনদের ২৩ নং ধারা
(গ) এসকাপের প্রতিবন্ধী দশক ও ১২ দফা কর্মসূচি, ১৯৯৩
(ঘ) প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতিসংঘের ২২ দফা স্ট্যাণ্ডার্ড রুলস

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতিবন্ধী ও অসহায় ব্যক্তির অধিকার

১. সকল মানুষ সমান : আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে ধনী-দরিদ্র, সক্ষম, অক্ষম নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর মানুষ ন্যায্য অধিকার লাভের অধিকারী।

হাদীসে উল্লেখ আছে, "তোমাদের কেউ নিজের জন্য যা ভালো মনে করে তা তার ভাইয়ের জন্য ভালো মনে না করলে ঈমানদার হতে পারবে না।"[৮]

উপরোক্ত বাণী থেকে স্পষ্টভাবে প্রমানিত হয় যে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ধনী, দরিদ্র, অক্ষম নির্বিশেষে সবার জন্য ইসলামের একই ধরণের ঘোষণা। অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি নিজের জন্য যা ভালো মনে করে, তা অসহায় কিংবা সক্ষম নির্বিশেষে সকরের জন্য উত্তম বিবেচনা করবে। এ পর্যায়ে প্রতিবন্ধি অসহায় জনগোষ্ঠীকে কোন অবস্থায় তুচ্ছ জ্ঞান করবে না।

২. তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যাবে না : নারী বা পুরুষ হোক কেউ কাউকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না। কেননা কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে-

"হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি। দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দনাম অতি মন্দ। যারা তাওবা করে না তরাই যালিম।"[৯]

এই দীর্ঘ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে সব মানুষই সম্মানিত। ঠাট্টা-বিদ্রূপ, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের উপনামে অভিহিত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া মৌলিক মানবাধিকারের অর্ন্তভুক্ত। আর তা হরণ করা হলে মানবাধিকারই হরণ করা হয়।

মহানবী স. বলেছেন, "মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ভাইয়ের প্রতি যুলুম করবে না, তাকে অপদস্থ করবে না, তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না। অতঃপর তিনি তার বুকের দিকে ইংগিত করে তিনবার বললেন, তাকওয়া এখানে। মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ-

তাচ্ছিল্য করা ও ঘৃণা করা অন্যায়। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের জীবন, সম্পদ ও সম্মান সবাই সম্মানিত"।[১০]

৩. শিক্ষা লাভের অধিকার : ইসলামে জ্ঞানার্জনকে অবশ্য কর্তব্য (ফরয) ঘোষণা করা হয়েছে। এ ঘোষণা সবার জন্য অবারিত এবং এ লক্ষ্যে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আয়োজন করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কাজেই কোন ব্যক্তি দরিদ্র কিংবা প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে তা সমর্থনযোগ্য নয়। শিক্ষা লাভের অধিকার ও মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়া থেকে কেউ কাউকে বঞ্চিত রাখতে পারে না।

৪. নাগরিক অধিকার : রাষ্ট্রের মানুষ নাগরিক তার নাগরিক অধিকার ভোগ করবে। এক্ষেত্রে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অক্ষম, রুগ্ন, আহত, দুর্বল প্রভৃতির মাঝে পার্থক্য করা যাবে না। এমনকি এদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে, অন্ধের জন্য দোষ নেই, খঞ্জের জন্য দোষ নেই, রোগীর জন্য দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদেরও দোষ নেই আহার করা তোমাদের ঘরে অথবা তোমাদের পিতাগণের ঘরে, মাতাদের ঘরে, ভাইদের ঘরে, বোনদের ঘরে, চাচাদের ঘরে, ফুফুদের ঘরে, মামাদের ঘরে, খালাদের ঘরে অথবা সেসব ঘরে যার চাবির মালিক তোমরা অথবা তোমাদের বন্ধুদের ঘরে'।[১১]

৫. সাধ্যের মধ্যে দায়িত্ব অর্পণ : শারীরিকভাবে অক্ষম ও দুর্বল ব্যক্তিকে তার সাধ্যের বাইরে কোন দায়িত্ব দেয়া যাবে না। বরং তার প্রতি সদয় আচরণ করতে হবে। যেক্ষেত্রে যতটুকু দায়িত্ব পালন তাদের পক্ষে সম্ভব কেবল ততটুকু কাজের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। কেননা কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে, "আল্লাহ কারো উপর এমন কোন কষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত[১২]।"

৬. যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা : যে সব লোক কোন কাজ করে আহার-যোগাতে অক্ষম তাদের সকল দায়-দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর বর্তাবে।

পক্ষান্তরে যারা কাজ করে আহার যোগানের উপযোগী, রাষ্ট্রের দায়িত্ব তাদের উপযোগী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি পৃথিবীতে তাদের প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎ কাজের আদেশ দেবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে।'[১৩]

মহানবী স. অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে যাকতুমকে তাঁর মসজিদের মুয়াজ্জিন নিয়োগ দেন এবং কখনো কখনো তাঁর পরিচালনাধীন রাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ করতেন। এ বিবরণ থেকে অক্ষম লোকদের মূল্যায়নের বিষয়টি পরিষ্কার

হয়ে ওঠে। অতএব রাষ্ট্র যদি তার সকল নাগরিকের বিশেষত প্রতিবন্ধী নাগরিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে, তাহলে তারা কারো জন্য বোঝা হবে না।

৭. জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করা : রাষ্ট্রের যে সব নাগরিক শারীরিক অথবা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী তাদের জনসম্পদে পরিণত করার বিষয়টি সরকারিভাবে কর্মসূচির তালিকায় রাখতে হবে। কোন অবস্থায় এদের অবহেলা করা যাবে না। ন্যূনতম শিক্ষা পেলে যারা নিজ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে এবং সুচিকিৎসা পেলে যারা নিজ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে- এদের ব্যাপারে রাষ্ট্রেকে এগিয়ে আসতে হবে।

৮. প্রতিবন্ধীদের প্রতি সদয় হওয়া : প্রতিবন্ধী ও অক্ষম লোকদের প্রতি সদয় হওয়া এবং তাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করা ইসলামের আচরণ বিধির অন্যতম। এ ব্যাপারে সূরা আবাসা-এ বর্ণিত ঘটনায় মানব সমাজের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে-

"সে ভ্রূকুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। কারণ, তাঁর নিকট অন্ধ লোকটি জানবে– সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো অথবা উপদেশ গ্রহণ করত। ফলে উপদেশ তার উপকারে আসত।[১৪]

৯. অন্ধ ব্যক্তির নামাযে ইমামত : অন্ধ ব্যক্তি নামাযে ইমামত করতে পারে। মহানবী স.-এর সাহাবী ইতবান ইবনে মালিক তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের নামাযের ইমামতি করতেন।[১৫] পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীর প্রচলিত আইনে প্রতিবন্ধী-অসহায় লোকদের অধিকার স্বীকৃত। ইসলামে এসব জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের কথা আরো জোরালো ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে এবং স্বয়ং মহানবী স. তাদের পূর্ণ অধিকার প্রদান করেছিলেন।

উপসংহার

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী নানা দিক থেকে অপূর্ণ হলেও এরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের দেশ বা সমাজ প্রতিবন্ধীবান্ধব নয়। কিন্তু সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি এবং দায়িত্ববোধের পরিবর্তন হচ্ছে। তারা মনে করে, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ,সেবা, সামাজিক পুনর্বাসন, কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদেরকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করা সম্ভব। তাদেরকে সুযোগ করে দিতে হবে যাতে স্বাবলম্বী হয়ে তারা জাতীয় কর্মকাণ্ডে অবদান রাখতে পারে। অথচ বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিশুরা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে সমাজের দরিদ্রতম এবং পরনির্ভরশীল অংশ হিসেবেই রয়ে যাচ্ছে। আইন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেখানে প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যবস্থা আছে। জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সংস্থা যেসকল প্রতিবন্ধীবান্ধব আইন ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রেখেছে বাংলাদেশ সরকার তার সবই মেনে নিয়েছে এবং আইনের অর্ন্তভুক্ত করেছে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তা

প্রয়োগের অভাব রয়েছে। আমাদের দেশের অনেক প্রতিবন্ধী বা তাদের পরিবার জানেন না যে, তাদের শিক্ষার অধিকার আছে এবং এজন্য সরকারি অর্থ সহায়তার ব্যবস্থা আছে। প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রে এসব অধিকার প্রতিষ্ঠা করা আরও কঠিন ও স্পর্শকাতর। প্রতিটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তাদের উপযোগী শিক্ষা ও কর্মের মাধ্যম সমাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা জরুরি এবং এ বিষয়ে সরকারকেও জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে আইনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়ে তাদের জন্য স্বাভাবিক জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। শিক্ষার পাশাপাশি কর্মপোযুগী প্রশিক্ষণ দিলে প্রতিবন্ধীরা দেশের অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। তাদেরকে স্বাভাবিক ও সুস্থতার পাশাপাশি স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে। কাজেই প্রতিবন্ধীদের সহায়তায় আমাদের সকলের এগিয়ে আসা উচিত।

তথ্যনির্দেশ

১. সমাজ সেবা অধিদপ্তর থেকে সংগ্রহকৃত তথ্য, ১৯ ডিসেম্বর, ২০১০, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার
২. স্মরণিকা "*ত্রিধারা*", ৩ ডিসেম্বর ২০০০, ৯ম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজসেবা অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম, পৃ. ১১
৩. স্মরণিকা "*ত্রিধারা*", পৃ. ১৪
৪. *বাংলাদেশের সংবিধান*, ১৯৭২, অনুচ্ছেদ ১৫(ঘ)
৫. *বাংলাদেশের সংবিধান*, ১৯৭২, অনুচ্ছেদ ১৭
৬.. নার্গিস, শেখ সালমা, *"প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা অধিকার: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত"*, সমাজ নিরীক্ষণ, সামাজিক গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র , সংখ্যা ৮০, ২০০৩, পৃ. ৭৩
৭. সিদ্দিকী, কামাল, *"সুন্দর জীবনের সন্ধানে"*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২, পৃ.২০
৮. বুখারী, ইমাম, *আস সহীহ*, অধ্যায় : আল ঈমান, অনুচ্ছেদ : মিনাল ঈমানি আইয়্যু হিব্বা লি-আখিহি মা ইউহিব্বু লি নাফসিহি, আল কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ৩।
৯. আল কুরআন, ৪৯, ১১
১০. মুসলিম, ইমাম, *আস সহীহ*, অধ্যায় : আল-বিররি ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাব, অনুচ্ছেদ : তাহরীমু যুলমিল মুসলিম ...... আল-কুতুবুস সিত্তা, রিয়াদ : দারুসসালাম, ২০০০ পৃ. ১১২৭।
১১. আল-কুরআন, ২৪ : ৬১
১২. আল কুরআন, ২:২৮৬
১৩. আল কুরআন, ২২:৪১
১৪. আল কুরআন: ৮০:১-৪
১৫. বুখারী, ইমাম, *আস সহীহ*, অধ্যায় : আত্ তাহাজ্জুদ, অনুচ্ছেদ : সালাতুত নাওয়াফিলি জামায়াতান, প্রাগুক্ত পৃ. ৯২

প্রবন্ধ লেখার নিয়মাবলী

১. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দুই কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে জমা দিতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় কিবোর্ড ব্যবহার করে (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2000) টাইপ / ফন্ট Sutonny MJ ব্যবহার করতে হবে। কাগজের সাইজ A4। প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন থাকবে : উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১.৬৫ ইঞ্চি, বামে ১.৬ ইঞ্চি। প্রবন্ধের সফ্ট কপি সংস্থার ই-মেইল ঠিকানায় মেইল করে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে লেখকের পেশাগত পরিচয় ও ঠিকানা থাকতে হবে।

২. প্রত্যেক প্রবন্ধের সাথে লেখককে/দের এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে :

ক) জমাদানকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/তাঁরা;

খ) প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোনো জার্নাল-এ মুদ্রিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য তা অন্য কোনো জার্নালে জমা দেয়া হয়নি;

গ) প্রবন্ধে প্রকাশিত তথ্য ও তত্ত্বের সকল দায়-দায়িত্ব লেখক/গবেষক বহন করবেন।

৩. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোন পাণ্ডুলিপি ফেরত দেয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক জার্নাল-এর ২ (দুই) কপি এবং ৫ কপি অফপ্রিন্ট বিনা মূল্যে পাবেন। একক লেখকের প্রবন্ধ অগ্রাধিকার পাবে।

৪. প্রবন্ধ বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসরণে (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান) রচিত হবে। তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

৫. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন হবে না। লেখক কোন বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে। টীকা ও বক্তব্যের উৎস উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে দিতে হবে। তথ্যনির্দেশের ক্ষেত্রে শব্দের উপর সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন[১]) সংখ্যা ব্যবহার করাই নিয়ম। তথ্যসূত্র সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার নিচে অথবা প্রবন্ধের শেষে উল্লেখ করতে হবে। গ্রন্থ ও জার্নাল থেকে তথ্যসূত্র এভাবে লিখতে হবে।

যেমন- গ্রন্থ :

১. এবাদুল হক, কাজী, *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, খ্রি.১৯৯৮, পৃ.২৯

২. ইবনে হাযম, *আল মুহাল্লা,* আল-কাহেরা : মাকতাবা দারুত্তুরাস, খ্রি.২০০৫, খ.১, পৃ.৯০

৩. হুসাইন, যিকরা তাহা, *জামহুরিয়াতু মিসর আলআরাবিয়্যাহ,* ওযারাতুস সাকাফা, আলকাহেরা : আল-মাকতাবাতুল আরাবিয়্যাহ, ১৯৭৭, পৃ.১০৩

প্রবন্ধ ঃ

১. Monsoor, Dr. Taslima, Dissolution of Marriages on Test; A Study of Islamic Family Law and Women, *Journal of the Faculty of Law*, University of Dhaka, Volume:15, Number:1, June 2004, p. 26

৬. মূল পাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি ৩০ শব্দের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। গ্রন্থ ও পত্রিকার নাম বাঁকা অক্ষরে (Italic) হবে। যেমন, গ্রন্থ ঃ *বিচারব্যবস্থার বিবর্তন;* পত্রিকা : *Journal of islamic law and judiciary*.

৭. কুরআনুল করীম ও হাদীসের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত কুরআনুল করীম ও হাদীসসমূহের অনুবাদ অনুসরণ করতে হবে। কুরআনুল করীমের উদ্ধৃতিতে অবশ্যই হরকত দিতে হবে। কুরআনের উদ্ধৃতি হবে এভাবে– আল কুরআন, ২:১৫। হাদীসের উদ্ধৃতি হবে এভাবে– বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায়:--, অনুচ্ছেদ:---, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান:---, প্রকাশকাল---, সংস্করণ--- খ.--, পৃ.। এছাড়া যে সকল প্রবন্ধে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি দেয়া হবে সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় তার অনুবাদ দিতে হবে।

৮. প্রকাশিত প্রবন্ধের ব্যাপারে কারো ভিন্ন মত থাকলে যুক্তিযুক্ত, প্রামাণ্য ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

৯. প্রবন্ধের শুরুতে 'সারসংক্ষেপ' এবং শেষে 'উপসংহার' দিতে হবে।

১০. কুরআন ও হাদীসের আরবী Text নিচে তথ্যপঞ্জিতে এবং অনুবাদ মূল লেখার সাথে দিতে হবে।

প্রবন্ধ প্রেরণের ঠিকানা
সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, নোয়াখালী টাওয়ার (স্যুট-১৩/বি), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন :০২-৭১৬০৫২৭, ০১৭১৭-২২০৪৯৮
ই-মেইল: islamiclaw_bd@yahoo.com

REGD. NO. DA. 237(1) ISLAMI AIN O BICHAR : July - September : 2010. Tk. 100

Design & Printing : An-Noor 01712510728, 01670837659